বড়বাবু

বিদ্যুৎ পাল

বড়বাবু

বিদ্যুৎ পাল

প্রতর্ক সাহিত্য সংসদ
১৪, বিশাল নিকেত, বাজার সমিতি রোড,
পাটনা - ৮০০ ০১৬

Barababu
By : Bidyut Pal

প্রথম সংস্করণঃ জানুয়ারী ২০০৯

মূল্যঃ ১০/-টাকা

মুদ্রকঃ প্রিন্ট কেয়ার কো০, পুনাইচক, পাটনা-৮০০ ০২৩

লেখকের অন্যান্য বই ঃ
আজকের দিনটার জন্য (কবিতা)
সমুদ্র দুভাবে ডাকে (কবিতা)

সূচীপত্র

উৎসর্গ পত্র

কমরেড নিসার

শেষগ্রীষ্ম তাঁকে খুব হাল্কা, কৃশকায় করে রক্তে
আরো এক বয়ঃসন্ধি দিয়েছিল, চাপতে রেকাবে;
বলেছিল, দেখ মিঞা এবারের বর্ষা হবে প্লাবী
অনেক পুরোনো ধোঁয়া মিঠে হয়ে চশমা ভেজাবে...
দুপুরে পুত্রের নীল জামাটি চড়িয়ে কাঁপা হাতে
মাথায় গামছা ফেলে, ধীরে হেঁটে, ককিয়ে অস্ফুট
পৌঁছোতেন বৈঠকে পার্টির, সমাবেশে, ও নিত্যই
সংগঠন দপ্তরে, ইষৎ ফস্কা যেন বা রংরুট ...

দেখতেন লোকেরা যা দেখে, মনে রাখে, ভোলে।
শুনতেন সব শোনা, বলা ও নিজের পালা এঁলে উঠে ধীরে
ন্যায়-অন্যায়ের চলিত প্রসঙ্গ থেকে রঙ্গে
(বুড়োটে মাকালদের ভেল্কি দিতে) গরলে ও ক্ষীরে
কারবালা, কুরুক্ষেত্র, কলিঙ্গের সন্ধ্যা ছোঁয়াতেন,
দৃষ্টি থেকে, সংখ্যা থেকে, আশা ও ক্ষোভের দ্বৈতে একচুল
পা রাখার জায়গা খুঁজে অকস্মাৎ ওড়াতেন
শ্রমের কেতনখানি প্রতিবার, অমোঘ, নির্ভুল।
সাথীদের ব্যস্ত বুকে হানতেন প্রশ্ন, যা দাঁতাল।
কেতাবী উত্তর ঠুকে ভাবি, বেশ লড়ছি তো,
কাজেই নিবদ্ধ আছে দিন!
অথচ সে প্রশ্ন নির্বিবাদ প্রথম তাঁর বিতর্কে হত জাদু।
বাঁচার চ্যালেঞ্জ হত, বেড়ে যেত কৌমঋণ!
তেঁতুল গাছের ছায়ে টাটকা মাটির ছোট্ট ঢিবি
তার নিচে শোয়ালাম এক ফালি অশান্ত পৃথিবী।

তোয়াজ

অবস্থীসাহেব এখনো রাগে ফুঁসছেন । পনেরদিন আগে খাওয়া ঘেরাওয়ের অপমানটা ভুলতে পারছেন না । ভোলার কথাও না । নিজের চাকরী জীবনে তাঁকে কোনোদিন এমন জবরদস্ত স্লোগানবাজির মুখোমুখি হতে হয়নি । চেম্বারের সামনের করিডোর থেকে ল্যান্ডিং হয়ে ওপর ও নিচের সিঁড়ি অব্দি যতদূর দেখা যায় মুখ আর হাত । সামনের মুখগুলো পরিচিত হয়েও যেন অপরিচিত । পিছনের মুখগুলি সন্দেহ-গভীর । তার পিছন থেকে মাঝে মধ্যে উঠে আসছে কুটিল মারমুখী বাক্যবাণ ।...

"আমি কি এতই খারাপ ? আমি যা করেছি কর্মচারীদের জন্য এর আগে কেউ করেছে ? দেখুন তো রেকর্ড !... তবে হ্যাঁ কিছু প্রিন্সিপ্‌ল আছে আমার। তার ওপর অনেক কনস্ট্রেইন্ট্‌সের মধ্যে কাজ করতে হয় । আমার ডিপার্টমেন্ট্‌স — তার হেডদের তো আমি এনে বসাইনি । দু' তিন বছরের জন্য এসেছি, চলে যাব। ওরা থাকবে । কেন ঠিক করেননি ওদের চাল চলন ? ওরা যা নোট দেবে সেই মতই তো করব । আফটারঅল, নট ফর এরোগেন্স, কিন্তু, আমি একজন হাই একজিকিউটিভ মানে আরো অনেক বড় বড় ব্যাপারে আমার মাথা ঘামাবার কথা — ব্যাঙ্ক পেজ মী ফর দ্যাট ! এই সব ছোট খাট বিষয় নিয়ে -- ইউ মাস্ট এপ্রেসিয়েট -- আমার নিজেকে ইনভলভ করা শোভা দেয়না। তাছাড়া কোন ইউনিয়ন রিকগনাইজড কোনটা নয়, কোনটা মেজরিটি কোনটা মাইনরিটি এসব তোমরা ইন্ডাস্ট্রি লেভেলে ডিসাইড কর !... আর তার পরও বলছি আমি তো কনসার্নড অফিসারকে দিয়ে সিগন্যাল পাঠিয়েছিলাম যে তোমাদের কোনো লোক থাকলে আগে বলে দিও, তারটাও দেখব । তোমরা তা না করে বাঁধাবুলি আউড়ে গেলে

নিয়ম অনুযায়ী কাজ হওয়া উচিত । আর যেভাবে শেষ অব্দি তোমরা কাজটা করালে !.... ছি ছি! আমি একজন সাধারণ ব্রাহ্মণ পরিবারের ছেলে; আমার সততা আমার একমাত্র সম্পদ ! আর আমাকে তোমরা বললে দুর্নীতিগ্রস্ত ! ভ্রষ্ট ! বেইমান! বললে কালো হাত গুঁড়িয়ে দেব ! ইশ্বরকে স্মরণ না করে আমি জলস্পর্শ করি না। আমার সারাজীবন মনে থাকবে তোমাদের ওই কথাগুলো । রিটায়ারমেন্টের পরেও ভুলব না । কিছুতেই না।...''

সত্যিই ভীষণ রেগে আছেন অবস্থী সাহেব । খবর পাচ্ছি যাকে সামনে পাচ্ছেন শুনিয়ে দিচ্ছেন কথাগুলো । সাথে এও বলছেন, ''আমি তো বলছিলাম না, শুনতে চাইলে তাই বললাম । কাউকে বলারও স্পৃহা নেই আর — এত দুঃখ পেয়েছি ।''

ফোন এল বড়বাবুর ।

— হচ্ছেটা কি ? এভাবে সংগঠন চলে ? ওদিকে অবস্থী মুখ ফুলিয়ে বসে আছে আর এদিকে তোমরাও ....

— আমরা আবার কি করলাম ?

— দু' মাস হয়ে গেল, একদিনও দেখা করতে গেছ ?

— কোনো ইস্যু থাকবে তবে তো ? সেরকম কিছু এলে নিশ্চই যাব!

— আর ইস্যু সেট্‌ল না হলে আবার সেই 'কালো হাত গুঁড়িয়ে দেব'...?

— ও শালা এরই পাত্র । গুমোর কত ! নীতিনিষ্ঠ সৎ ... আর যখন ফাঁদে পড়ল তখন রাত ন'টায় শ্রীবাস্তবকে দিয়ে বাড়িতে চিঠি ড্রাফ্‌ট্ করাচ্ছে! ক্যান্ডিডেটকে ভোর ছ'টায় চিঠি দিচ্ছে !

— কি করবে ! এরকমই হয় এসব মানুষেরা । নীতিগত কাজগুলোকেও

ব্যক্তিগত দাক্ষিণ্য হিসেবে করা, যা সময় নিয়ে করা যায় তা শেষ সময়ে রাত জেগে করে চমক সৃষ্টি করা... এতেই ওরা সার্থকতা পায় অবসাদগ্রস্ত জীবনে। পাব্লিক সেক্টর আর গভর্নমেন্ট ব্যুরোক্রেসির এটা সাধারণ লক্ষণ-- ব্যুরোক্রেটিক সেন্‌সেশনালিজ্‌ম ! সে যা হোক । তোমরা যাও ।

— কি করব গিয়ে ?

— একটু আমড়াগাছি করবে । তোয়াজ করবে । হ্যাঁ তে হ্যাঁ মেলাবে। কাজ তো করাতে হবে ওকে দিয়েই —যতদিন চেয়ারে আছে । বরুণবাবুর সাথে আমার কথা হয়েছে । ওঁকে নিশ্চই করে সঙ্গে নিয়ে যেও ।

মিটিং হল । আগামীকাল আছেন অবস্থী সাহেব । বিকেলে দেখা করতে যাব । কিন্তু কিছু ইস্যু তো চাই । 'আপনাকে তোয়াজ করতে এসেছি' বলে তো আর ঘরে ঢোকা যায়না ।

— কেন ? বলব যে শুনছি আপনি আমাদের সেদিনকার ডেমন্‌স্ট্রেশনে ব্যক্তিগতভাবে আহত হয়েছেন ।

— ধ্যুৎ ! ইউনিয়ন করি না প্রার্থনাসভা করি ? কবে আমরা ডেমন্‌স্ট্রেশন করি না ? হ্যাঁ সেদিনেরটা জবরদস্ত ছিল । তা ইস্যুটারও ওজন ছিল। ম্যানেজমেন্ট নাকি ক্লোজসার্কিট ক্যামেরা আর পুলিশ এলার্ট করিয়েছিল পরের দিনের আশঙ্কায়।

— ওসব ভোম্‌কা ! তাহলে আর রাত জেগে ইস্যুটা সেট্‌ল করল কেন ? পরের দিনটা দেখে নিলেই পারত ?

— সে সব কথা যাক । যা হয়েছে সেদিন, তাতে কারোরই দুঃখ পাওয়ার কথা নয় । জুলুম করছিল সেটাকে রুখে দেওয়া হয়েছে । ওভাবেই রোখা হয়। সেদিন ঘেরাও না হলে কাজ হত ? ... মিষ্টি মিষ্টি হেসে নিজের

রোয়াব বজায় রাখার চেষ্টা করছে আর দুঃখ দুঃখ ভাব করে নাটক করছে এই জন্য যে যাদের ওপর ছড়ি ঘোরাতো সেই সব অধস্তন অফিসারদের সামনে ওর ভয় ধরা পড়ে গেছে।

— ওর মিষ্টি হাসি আর মিষ্টি কথার জাল শালা শেখার মত।

— পুরোহিত শাসনের রক্ত বইছে ধমনীতে।

— বাজে কথায় সময় নষ্ট করে লাভ নেই। ইস্যু ঠিক কর। ও জানে আমরা কাজেই যাব ওর কাছে। তার বেশী ও আশাও করেনা, পছন্দও করেনা। অবস্থী তো করবেই না। ওরা এই ফারাকটাকে কাল্টিভেট করে যে ওরা কর্পোরেট আর আমরা এওয়ার্ড...।

— ইস্যু বলতে প্রমোশনের পরীক্ষা, সাবষ্টাফ থেকে ক্লারিকাল, সুইপারদের আপগ্রেডেশন...

— না না না। ওসব সর্বভারতীয়, অর্থাৎ নিরামিষ। এমন কিছু কাজ খোঁজো যা ছোট্ট কিন্তু একটু বেঁকা। ওর এক্তিয়ারের মধ্যে কিন্তু সাধারণ ভাবে নিয়মবহির্ভূত, ইর্‌রেগুলার। যেটা করলে ও বলতে পারবে দেখ তোমরা আমায় এত গালি দিলে অথচ তবুও এমন একটা কাজ তোমাদের করে দিলাম যা আর কেউ করতো না।... এতে ওর অহঙ্কার তুষ্ট হবে। আর যদি না করে তাহলে আমাদেরও বলার থাকবে যে আপনি পারতেন স্যার, শুধু আমাদের ওপর রাগ করে...।

— তা সেরকম ইস্যু বলতে কোল্ড স্টোরেজে একটা দুটো আছে -- ঝাজী'র সেকেন্ড হাউজিং লোনের ব্যাপারটা...

— আর ?

— দুটো ডেপুটেশন ক্যান্সেল করে ওদের ফেরৎ পাঠাতে চাপ দিচ্ছে অন্য ইউনিয়ন। ওদুটো যেন ক্যান্সেল না করে...

— এই তো বেরিয়ে এল। ক্যান্সেল হবে।

— তার মানে ?

— হরে রাম আর রাজেশ্বরের তো ? ও দুটো ক্যান্সেল হবে আর ক্যান্সেল হয়ে ওই জায়গাতেই এ্যাড্‌মিনিস্ট্রেটিভ ট্রান্সফার হবে 'ম্যানেজমেন্টের নিজের স্বার্থে'!

— হবে বরুণদা ?

— আলবাৎ হবে।

— ঠিক আছে। তাহলে এই সিদ্ধান্ত হল। কথা শুরু করবে বরুণদা। অবস্থী থেকে বেশী বয়সের মানুষ। আমাদের ভাইস প্রেসিডেন্ট। জেনারেল সেক্রেটারী শুরু করলে অবস্থী শুরুতেই বিগড়ে যেতে পারে। বরুণদা বরং আমাদেরই একটু ঝাড় টাড় দিয়ে দেবেন ওর সামনে — ছেলে ছোকরা বলে।

এয়ারকন্ডিশন্ড চেম্বার। পুরোনো ঘষা কার্পেটটা বদলে নতুন বাদামী রঙের পুরু নরম কার্পেট পাতা হয়েছে। সেক্রেটারিয়েট টেবিল, চেয়ার, সোফা... সবই নতুন। আগের জন অফিস-চেম্বারে লক্ষী, গণেশ সাজিয়ে রাখতেন। দশ আঙুলে দশটা সোনার আংটি, হীরে জহরৎ বসানো, বুকে পার্কারের কলম—শেষে সি. বি. আই. এর চক্করে পড়েছিলেন। তবু লোকটি আমাদের পছন্দসই ছিলেন। নীতি-ন্যায়-নিষ্ঠা নিয়ে গুমোর ছিল না। নাম, ঠিকানা, জাত, কুষ্ঠি, ঠিকুজি মনে রাখতেন প্রতিটি কর্মচারীর — সারা বিহারে। তার আগের জন তো আরো দিল দরিয়া। উদারপন্থী জমিদার একেবারে।...

অবস্থী সাহেব খাঁটি 'ধর্মনিরপেক্ষ' । পুজো আচ্চা বাড়িতেই সারেন। তিলকটুকুও মুছে আসেন অফিসে আসার আগে । উনি জানেন ওনার সবচেয়ে উঁচু পদে ওঠা কেউ আটকাতে পারবে না । সেই মনের জোর, পরিষ্কার ইমেজ আর নিজের কলম না খুলে সব কাজ করিয়ে নেওয়ার এলেম আছে। তার ওপর খুঁটিও আছে । বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ খুঁটি । মন্ত্রক অব্দি।

বরুণদা শুরু করলেন । চাপান উতোর চলল অনেকক্ষণ ।

— আপনারা অনুভব করুন তফাৎটা । আমার ডিপার্টমেন্ট কাজ করে। কেননা আমার নিজেরও টেবিল আমি পরিস্কার রাখি । কোনো কাজ পেন্ডিং নেই। ওই যে দেখুন বাইশটা ফাইল । দুপুরে এসেছিল - এখন ডিসপোজ্‌ড – পিওন এসে নিয়ে যাবে । কিন্তু আপনাদের আর কি বলব ? আমি তো ভ্রষ্ট, অসৎ, দুর্নীতিপরায়ণ...

— আচ্ছা আচ্ছা অনেক হয়েছে । এসব মনে রাখতে নেই । কত ওপরে যেতে হবে আপনাকে । এবার ছেলে ছোকরাদের কোল্ডড্রিংক খাওয়ান তো !

ভেল্কি ! অন্যদিন চা আসেনা, আজ সন্ধ্যে সাতটায় ফ্রুটি !

— নিন শুরু করুন, আরো আনছে ।

— না না, তা কি হয় ? আপনি আগে নিন ।

— নেব নেব ! এতো আমার অফিস । আপনারা অতিথি । এই ফ্রুটিতেই মিষ্টি মুখ করুন ।

— হ্যাঁ ! আপনিও করুন স্যার । ভেবে নিন ওসব অধ্যায় শেষ । চ্যাপ্টার ক্লোজ্‌ড। ইন্ডাস্ট্রিকে বাঁচানো আজ প্রাথমিক কর্তব্য সবাইকার । আপনি আমাদের ষ্টিওয়ার্ড। একসাথে আমাদের কাজ করতে হবে । আর আপনার মত ইম্‌পার্শিয়াল লোক । আপনার সাথে আমাদের সম্পর্ক কি

আজকের ?

বরুণদার হাত চাপলাম —'ডেপুটেশন' ! ভ্রূক্ষেপই নেই ।

— আপনি প্রশাসনকে একটা নতুন ইমেজ দিচ্ছেন স্যার ! ইট গোজ টু ইওর ক্রেডিট। দরবারী রাজনীতি আপনি বন্ধ করে দিয়েছেন । ওই সন্ধ্যা বেলায় ডি. জি. এমের বাড়িতে গিয়ে পা ছুঁয়ে প্রণাম করে হত্যে দিয়ে থাকা... । মানে প্রণাম করো ঠিক আছে, বয়স্ক ব্যক্তি জ্যেষ্ঠভ্রাতাসম পিতাসম...কিন্তু সেটা ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা থেকে হলে তবে তো ? শুধু তদ্বির করার জন্য ! তার ওপর মিষ্টির প্যাকেট, হ্যান ত্যান...

— আর আজ আপনারা মানে কর্মচারীরা জানেনও না আমি কোথায় থাকি । মানে অফিস সংক্রান্ত কাজে তাদের প্রয়োজন পড়ে না । আমি বলে দিয়েছি সবাইকে — হোম ইজ ফর মাই ফ্যামিলি । অফিসের কাজ অফিসেই হবে।

— দ্যাটস ইট স্যার ! এতে আমরাও অনেক হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছি । আপনি ওপরে গেলে, মানে আপনার মত লোকেরা ওপরে গেলে ইনস্টিটিউশনের একটা টার্ন এরাউন্ড, রিভাইভ্যাল সত্যিই সম্ভব হবে ।

'বরুণদা ইস্যু দুটো' ফিসফিসিয়ে মনে করালো যোগেশ ।

— ঠিক আছে স্যার । এবার উঠি ! মিষ্টিমুখের জন্য ধন্যবাদ । আর আমরা ভরসা রাখি যে আপনি পুরোনো কথা মনে রাখবেন না। যেমন ভাবে আপনি কর্মচারীদের জন্য কল্যাণমূলক কাজগুলো করে যাচ্ছিলেন তেমনই করে যাবেন । সেসব ইস্যু আর আজ নয় । এটা নিছক সৌজন্য সূচক সাক্ষাৎ ছিল আমাদের ।

বেরিয়ে এলাম ।

— বরুণদা !

— এক মিনিট । একটা কথা বলে আসছি ।

বরুণদা ভিতরে ঢুকে দশ মিনিট পর বেরিয়ে বললেন "চলো চলো সবাই ! এখানে দাঁড়িয়ে কথা হয় না ।"

লিফ্‌ট দিয়ে নিচে নেমে এলাম ।

— কি হল বরুণদা ? ইস্যু দুটো ?

— হয়ে গেল !

— কখন ?

— ওই যে পরে ঢুকলাম দশ মিনিটের জন্য ! আগেও কথা হয়েছিল ফোনে। বড়বাবুকে দিয়েও বলিয়েছিলাম ।

— সবাইকার সামনে তুললেন না কেন ?

— ওর একটা ইগো আছেনা ? ফোনে বলেছিল আমায় একা এসে কথা বলতে । তা আমি বললাম আসবো তো ডেলিগেশনে তবে তখন এ নিয়ে কথা বলবনা, পরে আলাদা করে বলব । এ ব্যাপারে বড়বাবুর অনুমতিও নিয়ে নিয়েছিলাম । তাই এভাবে করতে হল । এতে ব্যাপারটা দাঁড়ালো এই যে ও তোমাদের কথায় কাজ করেনি । নিজের ইচ্ছে অনুযায়ী করেছে ।

— কিন্তু সংগঠনের ইস্যু সংগঠনের ডেলিগেশনের সামনে ওঠা উচিৎ ছিল।

— উচিতের চচ্চড়ি । কাজ দুটো হোক, তারপর সার্কুলার বার কোরো যে আমরাই করিয়েছি । আমাদের আম খাওয়া নিয়ে কথা নাকি আঁটি গোনা নিয়ে ?

— তা ঠিক ।

রাজগঞ্জের চা

সকালে অফিসে গিয়ে বড়বাবুকে ফোন করলাম — কলকাতায় অল ইন্ডিয়ার মিটিং আছে — নোটিশটা পেয়েছেন কিনা জানতে ।

ফোন ধরতেই শুরু হয়ে গেলেন, "কি করছ কি তোমরা ? এভাবে সংগঠন চলবে ? তিনমাস ধরে বলছি কোলফিল্ডে যাওয়া দরকার — কোনো ভ্রুক্ষেপই নেই ।"

— বড়বাবু, অল ইন্ডিয়ার মিটিং এর নোটিশটা...

— নিকুচি করেছে নোটিশের । কি হবে অল ইন্ডিয়া করে ? যদি সংগঠন না বাড়াতে পারো ? কলকাতায় যাবে তো ধানবাদ গিয়ে ওখান থেকেই চলে যাও। জেনারেল সেক্রেটারি মশাই কোথায় ?

— আপনার যাওয়ার কথা কলকাতায় । তা আপনিও আমাদের সঙ্গে চলুন। ধানবাদ এলাকায় আপনি গেলে একটা আলাদা প্রভাব......

— আমাকে পেয়েছ কি ? আমার বয়স হয়নি ? আর কলকাতার মিটিং এ এবার আমি যেতে পারছিনা । যে ভাবে বললাম সেভাবেই নিজেদের প্রোগ্রাম করে নাও। জি. এস. মশাইকে বলবে আমায় ফোন করতে ।

ফোন রেখে দিলেন । যা হোক নোটিশ পেয়েছেন বোঝা গেল।

ঝিরঝির বৃষ্টি পড়ছিল কাত্রাসে অটো ধরার সময় । এবারের ট্যুরে রাজীব অর্থাৎ জেনারেল সেক্রেটারিও সঙ্গে নেই। বড়বাবু, বরুণদা বেশ কয়েক বছর ধরেই বয়সের কারণে ব্রাঞ্চ ভিজিট এড়িয়ে যান । খুব দরকার পড়লে বড়বাবু তবুও যান কিন্তু বরুণদা একেবারেই না । কাজেই আমি আর রহমান তিন দিনের প্রোগ্রাম করে বেরিয়েছি । ভোর বেলায় ধানবাদ পৌঁছে স্নান খাওয়া সেরে আগে ব্যাঙ্ক মোড়ের ব্রাঞ্চ । সোয়া এগারটার

মধ্যে বেরিয়ে কাত্রাস। এবার রাজগঞ্জের দিকে। দুটো বাজে।

রাস্তায় সজোরে বৃষ্টি হল মিনিট দশেক। রাজগঞ্জের মোড়ে নেমে যখন হাঁটা পথে গ্রামটার দিকে এগোলাম তখন বৃষ্টি আবার ঝিরঝিরে। একটু পরে থেমে গেল। শুধু লাল মেটে জলের সজোর ধারা নেমে যাওয়ার শব্দ আসছিল রাস্তার ফাটল ও আশে পাশের খানাখন্দগুলো থেকে। মেঘ সরিয়ে রোদ্দুরও ঝলমল করে উঠল খাটো ভুট্টা খেতের ওপর, সজনে আর পেঁপে গাছের পাতায়।

একটা বড় গোলাবাড়ির পাশে ছোট্ট দোতলা। একতলাটা ভগ্নস্তূপ। দোতলায় ব্রাঞ্চ।

আকাশ আবার অন্ধকার। চারদিকে গাছগাছালি। তার ওপর বিজলিবাতি নেই। জিজ্ঞেস করলামনা কখন থেকে নেই। সেই গোপীর ভাইয়ের বিয়েতে বরযাত্রী যাওয়ার অভিজ্ঞতা হত। নালন্দার ওই গ্রামে রাত ন'টায় পৌঁছে জিজ্ঞেস করেছিলাম আলো কখন থেকে গেছে। পাশ থেকে এক স্থানীয় রসিক বেশ দীর্ঘায়িত বাক্যে জবাব দিয়েছিলেন, "আপনি এভাবে জিজ্ঞেস করুন স্যার যে আলো এখানে শেষবার কোন সালে কত তারিখে কটার সময় এসেছিল — আমরা আপনাদেরই জন্য দিনক্ষণটা স্মরণ করে রেখেছি।" খোঁচাটা স্পষ্ট। যেহেতু রাজধানী থেকে আসছি যেখানে লোডশেডিং সত্ত্বেও আলো মোটামুটি ভাবে রোজই থাকে।

ঢুকতেই রহমানকে স্বাগত জানালো সবাই। ওর প্রথম পোস্টিং গোমোতে। পাটনায় ফিরে যাওয়ার পরেও এদিকে আসা যাওয়া করে। শ্বশুরবাড়িও এই এলাকায়। সবাই মোটামুটি চেনে ওকে।

গার্ড, ম্যানেজার, পিওন শান্তি দেবী (স্বামী মারা যাওয়ায় অনুকম্পার ভিত্তিতে চাকরী হয়েছে)... কিন্তু সে কই, যার জন্য আসা? সঞ্জয় কুমার?

শুনলাম আসেনি। জ্বর হয়েছে বলে খবর পাঠিয়েছে সকালে।

কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা হল। শান্তি দেবী আমাদের সদস্য। গার্ড অন্য ইউনিয়নের সদস্য হলেও হাবভাব দেখাল যে আমাদের সমর্থন করে। হয়ত খুশী রাখতে চায় পাছে ওর বদলির ব্যাপারে বাধা না দিই। আর ছোটো গ্রামীণ শাখার ম্যানেজার যেমন হয় — দেশ দুনিয়ার হালচাল আমাদের মুখে শুনতে সমান ভাবে আগ্রহী।

শান্তি দেবীই চা তৈরী করলেন। চা খেয়ে সবারই কিছু কিছু সমস্যার কথা জেনে বিদায় নিলাম। সঞ্জয় কুমারের ডেরার হদিশ নিয়ে ফিরে এলাম রাজগঞ্জের মোড়ে।

একটা মুদির দোকানের পাশ দিয়ে গলিতে ঢুকে সিঁড়ি। উপরে উঠে একটা মোটামুটি পরিচ্ছন্ন ঘর। ঘরের এক কোনে রান্নার ব্যবস্থা। ভিতর দিকের দরজার পিছনে পায়খানা ও স্নানের জায়গা, আন্দাজ করতে পারি, এ সব কিছুদিনের জন্য আসা ব্যাঙ্কবাবুদের পছন্দ বুঝে সদ্য তৈরি করানো হয়েছে।

সঞ্জয় কুমার বলল জ্বর নয়, আই. এ. এস. এর তৈয়ারী করার জন্য ছুটি নিয়েছে কয়েকটা দিন। আমরা যা হোক, অতিথি। সঞ্জয় জোর খাটিয়েই বেরুলো কিছু নাস্তার ব্যবস্থা করতে। আমি রহমানের দিকে তাকালাম।

— হবে না।

— কেন ?

— স্বপ্ন দেখছে।

— তাতে ক্ষতি কি ? দেখাই উচিৎ।

— নিশ্চই উচিৎ - তবে ওটাই সমস্যা।

— কিসের ?

— ইগো। ও এখন ভার্চুয়ালী হাকিম। কেরানী আর পিওনের ইউনিয়নের বাঁ আর ডান নিয়ে মাথা ঘামাবে কেন ?

— ও তো মেম্বার ওই ইউনিয়নের !

— সেটা তো... কেমনভাবে হয় তুইও জানিস !

সঞ্জয় ফিরে এল। পিছনে একটা ছোট্ট ছেলে। রেকাবিতে সিঙাড়া আর মিষ্টি নিয়ে। সঞ্জয় একটা খবরের কাগজ বিছানার ওপর বিছিয়ে বলল "এখানে রাখ্। একটু পরে চা নিয়ে আসিস। আর ওই গেলাস দুটো ধুয়ে জল ভরে দিয়ে যা।"

— নিন স্যার। এখানে যা পাওয়া যায় তাই একটু...।

খেতে খেতেই কথা শুরু করল রহমান।

— আপনার আর কি ? আপনি তো কিছু দিনের অতিথি ! তা প্রেলিম্‌টা প্রথমবার দিচ্ছেন ? না কি...

— না, প্রথমবার তো দু'বছর আগেই দিয়েছিলাম। পি. টি. তে হয়েও গিয়েছিল। মেন্‌সে একটু কেঁচে গেল - এ চাকরীতে আমি আসতেও চাইনি। বাবা মারা যাওয়াতে পরিবার একটু অসুবিধায় পড়ে গেল। দাদা অবশ্য বলেছিল, কোনো চিন্তা নেই, নিশ্চিন্ত মনে আবার তৈরি হতে। কিন্তু ভাবলুম, দাদারও তো অনেক দায় !

"ব্যাঙ্কের চাকরীতেও প্রমোশনের রাস্তা মোটামুটি ভালো" আমি বললাম, "আর পি. ও. র পরীক্ষাগুলোও তো আছে"...

— না স্যার এই চাকরীই আমার ভালো লাগেনা। পয়সাই তো সব নয়। জব্ স্যাটিস্‌ফ্যাক্‌শনেরও একটা ব্যাপার আছে। তাছাড়া...

রহমান ধরিয়ে দিল "ঠিক বলেছেন ! আই. এ. এস. এর ব্যাপারই

আলাদা। পুরো জেলার হাকিম হয়ে বসা"...

— আপনি তো এখনই হাকিম বানিয়ে দিলেন স্যার। আগে দেখুন হয় কিনা।

— হবে। নিশ্চই হবে। চেষ্টা আছে, নিষ্ঠা আছে, স্বপ্ন আছে হবে না কেন ? তবে আমরা যে জন্য এসেছি তা নিয়েও স্পষ্ট কিছু কথা হওয়া দরকার। যদ্দিন আপনি ব্যাঙ্কে আছেন (একবার সঞ্জয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে নিল) তদ্দিন আপনার মত ব্রাইট ইয়ং ছেলেরা একটা সঠিক মতাদর্শের সাথেই যদি থাকেন তাহলে আপনাদের বুদ্ধি বিবেচনা সক্রিয়তা সেই মতাদর্শের জোর হবে। (সঞ্জয় কিছু বলতে চায় কিন্তু রহমান থামেনা) আপনি যেই সংগঠনের সদস্য সেটা রিকগ্‌নাইজড এবং নিঃসন্দেহে সংখ্যাগরিষ্ঠ। আমরা সবাই একদিন ওই সংগঠনেই ছিলাম কিন্তু বেরিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছি। ওই ইউনিয়ন লড়াই এড়িয়ে গিয়ে কর্তৃপক্ষের সাথে সমঝোতা করে চলে আর তাতে কর্মচারী স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে আসে। আমরা লড়াই করি আর অনেক সময় কোনো চুক্তি না করেও কর্মচারী স্বার্থ রক্ষা করি। ওই ইউনিয়নের নেতৃত্ব নিজের হত জনপ্রিয়তা পুনরুদ্ধার করতে জাতের নামে সংগঠনের মধ্যেই সংখ্যাগরিষ্ঠ ব্লক তৈরি করে। তারাই জিও জিও ধ্বনি দেয় আর ভোট যুদ্ধ হওয়ার আগেই বিরোধী পক্ষকে মদ খাইয়ে, কিছু পাইয়ে দিয়ে, দু' একটাকে সঙ্গে নিয়ে আর বাকিদের দাবড়ে দিয়ে স্তিমিত করে দেয়। আমরা জাতপাত করিনা এবং সংগঠনের গণতন্ত্র সুদৃঢ় রাখার চেষ্টা করি সব সময়। বেশী কিছু নয় কিন্তু একটা ভরসা আপনাকে দিতে পারি যে আপনার কোনো রকম সমস্যা হলে আমরা সততার সাথে তার সমাধান করতে চেষ্টা করব। (এতগুলো কঠিন কঠিন কথা একসাথে বলে রহমানের মুখটা লাল হয়ে উঠেছিল)

— এত কথা বললেন স্যার কিন্তু আমার তো কোনো সমস্যা নেই সেরকম!

— তাহলেও ভালো । আমাদের শক্তি বাড়াতে আসুন !

— দেখুন স্যার একবার একটা সংগঠনের সদস্য হয়ে গেছি আবার সেটা বদলে...

— সে তো হয়েছেন না জেনে। রিকগ্‌নাইজড ইউনিয়ন বলে ওরা এপয়েন্টমেন্ট লেটারের সাথেই সদস্যতা ফর্ম পাঠিয়ে দেয় । ব্যাপারটা বেআইনি তবুও কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে ওদের মদত করে ।

— সরি স্যার, আমার সেরকম কোনো সমস্যা এলে আপনাদের কথা মনে রাখব এই ভরসা দিতে পারি ।

রাতে ধানবাদে থেকে গেলাম ভোর বেলায় কোলফিল্ড ধরব বলে। বুথ থেকে বড়বাবুকে ফোন করলাম ।

— রাজগঞ্জের চা তেতো হয়ে গেল বড়বাবু । ও তো রাজনীতি ফাজনীতি কিছুই বলেনা । খালি বলে আমার কোনো সমস্যা নেই।

— হ্যাঁ ভুল হয়ে গেল। দার্শনিক তত্ত্ব আওড়ালেই তো আর কেউ মেম্বার হয় না!

— তার মানে ?

— সমস্যাটা আগে তৈরি করে নেওয়া উচিৎ ছিল ।

— সে কি আপনিও সেই ওদের মত মেমো, শোকজ খাইয়ে দলে টানার কথা ভাবছেন না কি ?

— আরে না । ও নিশ্চয়ই নিজের ট্রান্সফারের ইচ্ছের কথা জানায়নি! জানাবে কি করে ? ব্যাঙ্কে চাকরী পেয়েই একটেরে রুরাল ব্রাঞ্চে পোষ্টিং! ও তো জানে যে এক বছর না পেরুলে ট্রান্সফার হবে না - এটাই

নিয়ম। ওর বাড়ি তো ডালটেনগঞ্জে তাই না ?

— হ্যাঁ ।

— ওদিকে শংকর মাহাতো আছে আমাদের । শংকরের বাড়ি সিন্দ্রিতে । শংকরকে বলো ওর কাছে গিয়ে মিউচুয়াল ট্রান্সফারের কথা বলতে । শংকরেরও লাভ হবে। আর এ টোপটা গিলবে । তখন মেম্বারশিপের কথাটা তুলো । মিউচুয়াল করিয়ে দিতে কোনো অসুবিধা হবে না । আর শোনো, ধানবাদে কাত্রাসে সব ঠিকঠাক আছে তো ?

— হ্যাঁ দু জায়গাতেই সবাইকে নিয়ে বসে...

— ঠিক আছে । কলকাতায় পৌঁছে এক নম্বর...

বড়বাবুর সাথে ফোনে কথা বলার এই মুশকিল । সব উপদেশ ফোনেই সারবেন । বিল ভরতে গিয়ে পকেট ফাঁকা হয়ে যায় ।

কলকাতার মিটিং সেরে ফিরে এসে শংকরকে খবর পাঠালাম । শংকর সক্রিয় ছেলে — গেলও । ফিরে পাটনায় এসে খবরটাও দিয়ে গেল।

— কি হল ?

— বড়বাবুকে বলে দেবেন ওনার অঙ্কেও ভুল হয় ।

— হয়েছেটা কি ?

— ও মিউচুয়াল নেবে, সদস্যতাও নেবে । কিন্তু দশ হাজার টাকা আমায় দিতে হবে।

— তার মানে ?

— ওখানে এডভান্সে ম্যানেজারের সঙ্গে মাল কামাচ্ছে না ? তার ক্ষতিপুরণ কে করবে ? তাও পুরোটা চাইছেনা — কিছুটা অন্ততঃ !

— ও বাবা । এই জন্য আই. এ. এস !

নরকের গোলাম

সদ্য ঘুমটা ভেঙেছে। আরেকটু ঘুমোনো যায় কিনা ভাবছি এমন সময় ডাক পড়ল। বাইরে কেউ এসেছে, আমায় খুঁজছে।

বেরিয়ে দেখি অমর। মুখটা রাত জাগা, ক্লান্ত। একটু ভিতরে গোটানো দৃষ্টি—যেন সবসময়, যা আশা করছে তার উল্টোটাও শোনার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে।

– কি ব্যাপার ? এত সকালে ?

– আপনার ক্যামেরাটা আছে ?

– হ্যাঁ, কিন্তু...

– রীল ভরা আছে ? মানে দু' একটা স্ন্যাপ...

– হ্যাঁ ! হ্যাঁ ! কিন্তু কেন্ ? কি হয়েছে ?

– না, মানে আমার ছেলেটা মারা গেছে আজ...

– কি ?

– ভোরবেলায়। কাল রাতেই হাসপাতালে এ্যাডমিট করেছিলাম। এখনো বডি ওখানেই রয়েছে। যদি দু' একটা স্ন্যাপ তুলে দিতেন ! অসময়ে বিরক্ত করলাম।

আমার মুখ দিয়ে গোঙানির মত আওয়াজ বেরুলো। এত ভয়াবহ রকম সেন্টিমেন্টাল হতে পারে কেউ ? না কি ও আমার সাথে একটা অলঙ্ঘ্য দুরত্ব বজায় রাখতে চায় ? সেন্টিমেন্ট না ইগো ? না দুটোই ? ছেলে মারা গেছে আর এসে সংকোচের সাথে জিজ্ঞেস করছে ক্যামেরায় রীল আছে কিনা ? তার ওপর একটা চাবুক – 'অসময়ে বিরক্ত করলাম' !

রাগে ক্ষোভে আর অহেতুক অপমানের জ্বালায় আমার চোখ ফেটে

জল আসছিল। কিন্তু ব্যাপারটা এমন—কোনো কথা না বলে ক্যামেরা নিয়ে এলাম ঘরের ভিতর থেকে। ওরই স্কুটারের পিছনে বসে পৌঁছোলাম হাসপাতালে। বাচ্চা-ওয়ার্ডের বাইরে উঠোনে বারো বছরের ছেলের মৃতদেহটা শুইয়ে রাখা। দেখতেই একটা অদ্ভুত অনুরূপ কল্পিত দৃশ্য মাথায় নিজের অজান্তেই চলে এল। অনেক আগে, তখন আমি ও অমর দুজনেই সাইকেলারোহী – ওকে নিয়ে ডাব্‌ল রাইড করে গান্ধী ময়দানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। মে মাসের দুপুর। অমর বলছিল ওর শৈশবের কথা। জগদীশপুরের কাছে কোনো গ্রাম। কুঁয়োর পাড়ে, বাগানে জেঠের দোপহরীতে শিশুদের খেলা। শিশুদের মধ্যে প্রতিযোগিতা – আড়াআড়ি একটা বাঁশ ফেলে, তার ওপর দিয়ে হেঁটে বড় কুঁয়োটা পেরুতে হবে। অমরের পালা। টলমল করতে করতে মাঝামাঝি পৌঁছেছে ঠিক তখনই বাগানের এক প্রান্তে ঢুকে অমরের বাবা অমরকে দেখতে পেলেন। তিনিও কাঠ অমরও কাঠ।

অমর বলছিল, "কি ধৈর্য্য আর বিচারবুদ্ধি বাবার ! বাবা একবার চীৎকার করলেই নির্ঘাৎ পড়ে যেতুম। আর অবধারিত হত মৃত্যু। কিন্তু চীৎকার করলেন না। নড়লেনও না। আস্তে আস্তে টলমল টলমল করতে করতে কিনারে পৌঁছে লাফ দিতেই বাবা ছুটে এসে আরম্ভ করলেন বেদম বড়ম পেটা..."।

অমরের ছেলের মৃতদেহটা দেখেই চকিতে মনে হল এটা কুঁয়ো থেকে বার করা অমরের মৃতদেহ। আর আমাকে নিয়ে এসে এবার ওই শরীরের শিয়রে ঝুঁকে বসে আছে অমর নয়, অমরের বাবা।...

ছবি তুললাম।

তৃতীয় দিন বড়বাবু এলেন। রাজীব জোনাল অফিসে গিয়েছিল।

— চলো অমরের বাড়ি যাব।

— বসুন বড়বাবু। বরুণদা, দেখুন বড়বাবু এসেছেন। কাল খবর দেন নি কেন?

— আগে স্থির ছিলনা। তোমাদের বৌদির শরীর তো জানোই। আজ ভোরে উঠতে নিজেই বললেন যাও ঘুরে এস। তাই প্রথম স্টীমারটা ধরে চলে আসতে পারলাম। রাজীব কোথায়?

— জোনাল অফিসে গেছে। আসবে এক্ষুনি।

এতক্ষণে অফিসের আরো অনেকে, বড়বাবু এসেছেন খবর পেয়ে ছেঁকে ধরেছে। বড়বাবুর জনপ্রিয়তা কিছুতেই কমেনা, যতই দিন বদলাক। ওনার রাতের মজলিশে স্থান পাওয়া এখনো ভাগ্যের ব্যাপার। সে কথা অন্যত্র বলা যাবে।

রাজীব ফিরে এল। ততক্ষণে গোপালের হোটেলে নিয়ে গিয়ে বড়বাবুকে ভাত খাইয়ে দিয়েছি। কাজকর্ম তাড়াতাড়ি সেরে কিছু অন্য কমরেডদের গছিয়ে রাজীব আর বরুণদা স্কুটারে আর আমি বড়বাবুকে নিয়ে রিক্‌শয় চারটে নাগাদ গিয়ে পৌঁছোলাম অমরের বাড়ি।

বাড়িতে প্রতিদিনই লোক বাড়ছে। আত্মীয় স্বজনেরা আসছেন বিভিন্ন জায়গা থেকে। পুরো পরিবেশটায় বয়স্ক গুরুজন, মেয়েমহল আর আচার-বিচারের হেজেমনি। জন্ম মৃত্যু বিবাহে এরকমটাই হয় -- কেউ করুক আর না করুক আমরা নিজেরাই নিজেদের মানসিকতা নিয়ে কোণঠাসা হয়ে পড়ি। মাথায় বড়বাবুর গুরুবাক্যটাতো কাজ করছেই। "ওকে বার করে আনো। একমাত্র ছেলের এই বয়সে চলে যাওয়াটা বড়

শক। তাড়াতাড়ি কাজের মধ্যে ফিরিয়ে না আনতে পারলে ওকে ডুবিয়ে ছাড়বে। অর্থোডক্স পরিবারের সংস্কার। এত ভালো, সেনসিব্‌ল আর সৎ ছেলেটা।"

রিক্‌শায় বড়বাবুর কথা শুনতে শুনতে আমি হঠাৎ হেসে ফেলেছিলাম।

— হাসছ কেন ?

— আমাদের গার্ড মিশিরজী বড় বড় চোখ করে বলছিল, "একমাত্র ছেলে ছিল! আর সবচেয়ে বড় কথা যে শেষ মেয়েটা হওয়ার পর নিজের অপারেশন করিয়ে নিয়েছিল। বলুন এরকম বোকামী কেউ করে ? বৌয়ের করাতিস, নিজের করাতে গেলি কেন?"

— তা এতে হাসির কি হল ?

— কি বিচিত্র সমাজে আমরা আছি। যেখানে সন্তান, বারো বছর ধরে বেড়ে ওঠা আমার রক্তের অংশ, আমার বাৎসল্যের মুখ, আমার চৈতন্য নয়, নিছক একটা পুরুষ-একক, বংশধর — আরেকটা হবার সম্ভাবনা থাকলেই অনেকটা ক্ষতিপুরণ হয়ে যায় তার মৃত্যুর। আর তার জন্য আমি নিজের বৌকে পাশ কাটিয়ে দ্বিতীয় বিবাহ করার অধিকার রাখি। হরিব্‌ল।

— হুম্‌ম। অনেক কিছুই হরিব্‌ল এই জীবনে।

— এই জন্য আমার এসব জায়গায় যেতেই ইচ্ছে করে না। কি বলব গিয়ে ? কাকে স্তোক দেব ? কি দেব ? চারদিক থেকে ওই ধরণেরই হাজারটা কথার মধ্যে ক্রমাগত অপমান ঝরবে নারীদের প্রতি। কথার ভীড়ে হলুদ কালো জামা পরা বারো বছরের ছেলের মুখটা হারিয়ে যেতে থাকবে।

— তুমি তো হাসপাতালে গিয়েছিলে।

— হ্যাঁ। সে তো বল্লাম ফোনে আপনাকে যে অমর ভোরবেলায় আমায় ডেকে কিভাবে কথাটা বলল।

— ও ওরকমই। তেমনি একরোখা। কর্ত্তৃপক্ষের সামনে গিয়ে কোনো সমস্যা তুললে তার নিষ্পত্তি করিয়ে ছাড়বে। এ ব্যাপারে অসাধারণ ক্ষমতা ওর। সে যাক। কি মনে হল ? ছেলেটা মারা গেল কিভাবে ?

— ডাক্তার তো একবার বলছে, বিকেলে ওই খেলার সময় মাথার পিছনে চোট লেগে ইন্টারনাল ইনজ্যুরি, হেমারেজ। আবার বলছে মেনিনজাইটিসের লক্ষণ ছিল। কিছু বুঝতে পারছিনা।...কি সুন্দর ছেলেটা! আর চোখ বন্দ করে শুয়েছিল এমন...যেন ও জানে যে ইশ্বরের ইচ্ছায় ও আর বড় হবেনা কোনো দিন। কিন্তু তবুও আমাদের ওপরে সে। আমাদের শিক্ষক। আমাদের অসহায়তার দায় থেকে মুক্ত করে মৃত্যু নামের এক রহস্যময় সত্যের ভিতরে ঢুকে মিটি মিটি হাসছে। এক্ষুনি কিছু বলবে। আমরা শুনব। আমরা, নরকের অক্ষম গোলামেরা...

বড়বাবু পিঠে একটা হাত রাখতে সম্বিত ফিরেছিল যে রিকশটা অমরের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে। বড়বাবু ভাড়া মিটিয়ে দিচ্ছিলেন, আমি তাড়াতাড়ি ওনাকে থামিয়ে পয়সা বার করলাম।

অমরদের বাইরের ঘরটায় বসেছিলাম। আরো দুজন ছিলেন, ওর দাদার অফিসের বয়স্ক সহকর্মী। অমর মাথা নিচু করে বসেছিল। হঠাৎ ভিতর ঘরের দিকে মাথাটা ঘুরিয়ে বলল আপনাদের জন্য একটু চায়ের ব্যবস্থা হতে পারে কিনা দেখে আসি। রাজীব সজোরে ধমক দিল।

— বস্ তো! তোর এখন চায়ের চিন্তা ?

বড়বাবু কিছু বলতে যাচ্ছিলেন রাজীব তাঁকেও ধমক দিল।

— কিছু না। ভিতরে আবার ওর কি কাজ থাকবে এখন ? ওর

স্বভাবটাই এরকম চাপা। ভিতরে ওই কান্নার পরিবেশে যত থাকবে তত মন গুমরে উঠবে।

— তোমার বৌ কেমন আছে ?

— এখন অনেকটা সামলে উঠেছে। ওকেই বা আমি কি বোঝাবো। বার বার মনুর মুখটা ভেসে উঠছে। এখনই ওর স্কুল থেকে ফিরে আসার সময় ছিল রোজ।

রাজীব ভিতর থেকে উত্তেজিত দেখাচ্ছিল। একটা সিগারেট ধরালো। শোকের বাড়িতে কেউ সিগারেট খাবেনা এমন কোনো কথা নেই তবে একটু বেমানান দেখালো — কেননা কেউই সিগারেট, পান খাচ্ছেনা। ছাই ঝাড়ার জন্য বাইরে দুপা গিয়ে আবার ফিরে এসে বসল।

— কি আশ্চর্য ব্যাপার। একটা জ্বলজ্যান্ত ছেলে মরে গেল আর ডাক্তার বলতেই পারছেনা নিশ্চিত হয়ে কারণ কি ! ইনটারনাল ইনজুরিও হতে পারে, মেনিন্‌জাইটিসও হতে পারে। আর নিয়েও গেলি তো ওই নরকে ?

— ও কি করবে ? স্থানীয় ডাক্তার, যাঁকে দেখিয়েছিল তিনি নিশ্চই মেডিক্যাল এমার্জেন্সী দেখে বলেছিলেন পি. এম. সি. এইচ. এ নিয়ে যেতে। নার্সিহোমে এখানে তো আর এ ধরণের এমার্জেন্সী কেস নিতে চায় না। আর নার্সিহোমেই বা কি এমন ভালো। রুগীর চেয়ে রুগীর এটেন্‌ডেন্টের পকেটের দিকে বেশী নজর। সরকারী বড় হাসপাতালের ওপর যা ওয়ার্কলোড; কোনোদিন এমার্জেন্সীতে চব্বিশ ঘন্টা কাটালে বুঝতে পারবে। তাছাড়া আর যাবে কোথায় ?

— পুরো সিস্টেমটা নরক। উপরে রোমের অভিজাতকুল নিজেদের রমণীয় উদ্যানে, বীথিতে পরিভ্রমণরত, এ্যাম্ফিথিয়েটারে কোলাহলমুখর

....আর নিচে ব্যারাকে বন্দীশালায় আমরা গোলামেরা । এক একটা করে মৃতদেহ প্রিয়জনের, ওপর থেকে ছুঁড়ে ফেলা হয় আর আমরা সেই দেহ ঘিরে সন্ত্রস্ত গলায় কথা বলি, মোমবাতি জ্বালাই, শান্তি কামনা করি তারপর ঘুমোতে চলে যাই । আবার একটা মৃতদেহ পড়ে বন্দীশালার মেঝেতে । ...

আর ওই যে ভিতর ঘরে কান্না, এ্যান্থ্রোপয়েড এপ্‌সদের বিলাপ...

— এ্যাই চুপ, সুমন ! কী, হচ্ছে কী ?

— সরি !

উত্তেজিতভাবে আমি আর রাজীব বাইরে গিয়ে দাঁড়ালাম । আমি বরুণদার দিকে তাকালাম। বরুণদা বড়বাবুর দিকে তাকালেন ।

— আমরাও উঠি অমর ! শ্রাদ্ধকর্ম কবে হবে ?

— সাতাশে ।

— কোনো প্রয়োজন হলে বলবে । আমরা সবাই আছি । রাজীব বা সুমন তো আসবেই মাঝে মধ্যে । আর ধীরে ধীরে সামলে ওঠো । ডিউটিতে তো সাতাশের পরেই যাবে ?

— হ্যাঁ । তার আগে ...

— বলছিও না । তার পরেই যেও । চলি !

মোড়ের মাথায় এসে বরুণদা ধরলেন আমায়।

— তোর হয়েছিল কি ? নাটকের ডায়ালগ দিচ্ছিলি ?

— ওটা নাটকের ডায়ালগ ?

— যে সমাজে আছি তার ভাষাতেই তো কথা বলতে হবে । সইতে হবে তার অনেক কিছু । অনেকদিন অব্দি ।

— হ্যাঁ ! যেমন বারো বছরের ছেলের শ্রাদ্ধ, ব্রহ্মভোজ--আমরা বোঁদে আর লেডিকেনী খাবো ।

— প্রথাটা হয়তো পুরোনো । গা গুলোয় । কিন্তু উদ্দেশ্যটা তো এক । শোককে একটা পর্য্যায়ে শেষ করে জীবনে ফিরে আসা। আমরাও তো তাই চাই।

বড়বাবু অনেকক্ষণ কিছু বলেন নি । এবার বললেন ।

— যাই বলুন বরুণবাবু, বারো বছরের ছেলের শ্রাদ্ধ তার বাপ মা কে রোজকার জীবনের স্বাভাবিকতায় ফিরিয়ে আনতে কতখানি সহায়ক হবে জানিনা তবে রাজীব আর সুমনের ওই নাটকীয় আউটবার্স্ট কিন্তু অমরকে খুব সফল ভাবে নাড়া দিয়েছে। অমরের চেহারা অনেক হাল্কা হয়ে উঠেছিল ওই কথার পর। হুমম্, নরকের গোলাম। রিমার্কেব্‌ল! মনে থাকবে।

মানসী

বলতে না বলতেই মানসী বসে পড়ল অনশনে ! এগারটাও বাজেনি । সবে কাজকর্ম শুরু হয়েছে । আগের দিনের কথার জের টেনে আমি বরুণদাকে আর রাজীবকে বলতে গিয়েছিলাম যে ব্যাপারটায় দেরী করা ঠিক হচ্ছে না । প্রভুনাথ চৌধুরি লোক খারাপ নয় । নানা ভাবে আমাদের সাহায্যও করেন । এটাও ঠিক যে উনি খারাপ কিছু ইঙ্গিত করে কথাটা বলেন নি । কিন্তু মানসীর বুকে বেজেছে কথাটা । নিঃসন্দেহে ওকে তাতিয়েছে ওর আশে পাশে বসা অমলেন্দু, মালতীদি, আরো দু' চারজন। কিন্তু ব্যাপারটা এখন এমন যে সংগঠনের তরফ থেকে প্রতিবাদ না করলে মানসী আরো অপমানিত বোধ করবে। সেদিনই প্রভুনাথ চৌধুরীকে চেপে ধরলে হয়ে যেত । সেটা হয়নি । সেদিন আমরা কেউ ছিলাম না । প্রভুনাথ চৌধুরীও গোঁয়ার কম নন। পরে যখন রাজীব আর বরুণদা গিয়ে অনুরোধ করল উনি বেঁকে বসলেন।

— আমি ক্ষমা চাইব ? কেন ? কানি কে কানি বলেছি বলে ?

— আবার স্যার আপনি আপত্তিকর ভাষা ব্যাবহার করছেন ।

— নিকুচি করেছে ভাষার । যখন ওকে বলেছিলাম কানা চোখটা দেখতে ভালো লাগেনা, আলিগড়ে গিয়ে পাথরের চোখ বসিয়ে নে, তখন ভাষা আমার খারাপ ছিলনা । ব্যাঙ্কে বিল রিম্বার্স হওয়ার আগে ওর যাওয়া আসা অপারেশনের খরচ মেটাতে দশ হাজার টাকা ব্যক্তিগতভাবে আমি দিয়েছিলাম, সেটা নিতে খারাপ লাগেনি । সেদিন ওকে বললাম বিয়ে করছিসনা কেন, একটা কানা চোখের জন্য বিয়ে আটকাবে না, ভালো বিয়ে হবে, বলতো আমি চেষ্টা করি, সেদিনও কানা শব্দটা খারাপ লাগেনি। আর

জল দিতে দেরী করল বলে বললাম, পিপাসায় একটু জল দিবিনা মানসী ? তো তেড়ে আমার দিকে তাকাল ! তাতেই আমি বললাম, বাবা কি তেজ! কানা হলে কি ! তুই তো এক চোখের তেজেই ভস্ম করে দিবি দুনিয়াকে। ব্যস অপমান করা হয়ে গেল ? ও পিওন । জল চাইতে পারবনা ?

আমরা কিছু একটা বলতে গিয়ে আড়ষ্ঠ ভাবে চুপ্ করে আছি দেখে আবার বললেন "জানি তোমরা কি ভাবছ । ওই অর্থ বিভ্রাটটা আমার কানেও গেছে । ওর পাশের ওই মালতী, অমলেন্দু কান ভরেছে যে পিপাসায় জল দেওয়ার কথাটা নাকি অশ্লীল অর্থে বলেছি ! হাঃ, নিকুচি করেছে । মানসী যদি আমার সম্পর্কে এরকম ভাবতে পারে তাহলে চুলোয় যাক । যা ইচ্ছে হয় করুক। আমি তোমাদের অনুরোধ রাখতে পারছি না।"

আর 'করুক' । ও তো করেই ফেলল । আর সময় বুঝে করল । আগামীকাল ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান আসছে । আর আজ এই এখন বরুণদা, রাজীব, আমি, মনীশ কথা বলছি — আসিফ এসে বলল, "মানসী তো বসে গেছে বাইরে অনশনে!"

— সেকি ? কখন বসল ? আসার সময় তো দেখিনি !

— এই তো বসল ! মালতীদি ওর গলায় মালা টালাও পরিয়ে দিয়েছেন। পোষ্টারও লিখিয়ে নিয়েছে একটা ।

— কী লেখা আছে পোষ্টারে ?

— প্রভুনাথ চৌধুরীকে অভদ্র কথা বলার জন্য ক্ষমা চাইতে হবে আর...

— আর ?

— ওর প্রভিডেন্ট ফান্ডের হিসেবের গরমিল ঠিক করতে হবে ।

— যাক বুদ্ধি আছে। রাস্তা রেখেছে। নিচে কি লেখা ?

— নিচে আবার কি ?

— মানে ইউনিয়নের নাম দিয়েছে ?

— হ্যাঁ। আমাদের ইউনিয়নের নাম রয়েছে।

— ইউনিয়নের সিদ্ধান্তে তো ও বসেনি অনশনে ?

বরুণদা হাসলেন। "সে বললে কি আর হবে ? তুমি কি গিয়ে বলবে, এটা ইউনিয়নের সিদ্ধান্ত নয় কাজেই অনশন ফেরৎ নাও ?"

— না তা বলা যাবে না।

— ইউনিয়নের নাম না দিলেও উপায় ছিল না। সদস্য তো আমাদেরই। দায়টাতো আমাদের সবাইকার।

— চলুন বাইরে গিয়ে দেখে আসি পরিস্থিতিটা।

বাইরে বেশ ভীড় জমে উঠেছে। অন্য ইউনিয়নের নেতারাও কোনো না কোনো অছিলায় বাইরে এসে দেখে যাচ্ছে। তাছাড়া গ্রাহকেরা, গার্ড, ড্রাইভার। আমরা পৌঁছোতে সবাই মুখ ফিরিয়ে চাইল। পরীক্ষার সময়। মুহুর্ত্তের মধ্যে, হয় মানসীর ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তকে ইউনিয়নের করে নিতে হবে নয়ত ব্যক্তিগত বলতে হবে। বললেও সমর্থন অথবা বিরোধ — মোট কথা সংগঠনের অবস্থান এক্ষুনি স্পষ্ট ভাবে বলতে হবে। মিটিং করে আসছি, বলা চলবে না। কি করা যায় ?

জেনারেল সেক্রেটারী রাজীব। বলতে ওকেই হবে। ওর দিকে তাকাতে দেখলাম বরুণদাকে কিছু বলছে, বরুণদা মাথা নাড়ছেন। দু সিঁড়ি ওপরে উঠে রাজীব শুরু করল।

"কমরেড বরুণদা, কমরেড মানসী এবং কমরেডস্ ! যে দুটো

দাবী নিয়ে কমরেড মানসী আজ এখানে অনশনে বসেছেন সে দুটোর সমাধানের জন্য আমরা কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে লাগাতার কথা চালিয়ে যাচ্ছিলাম। আশা করছিলাম দু' একদিনের মধ্যে দুটো দাবীই পুরণ হবে। হঠাৎ আজ সকালে এখন খবর পেলাম, কমরেড মানসী অনশনে বসে গেছেন। বলতে দ্বিধা করবনা যে অনশনের সিদ্ধান্ত ওনার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত। হয়ত দাবী পুরণের জন্য কর্ত্তৃপক্ষকে যে সময়টুকু দেওয়া আমাদের যুক্তিসঙ্গত মনে হচ্ছিল সেটাকে উনি অহেতুক দেরী বা টালবাহানা মনে করছিলেন। এরকম হতেই পারে। যাকে ভোগ করতে হয় তার জায়গা থেকে সমস্যাগুলোকে দেখবার আশ্বাস দিলেও হয়ত ত্রুটি থেকে যায় আমাদের কাজে — আমরা ভগবান নই ! তবে মানসী আমাদের সদস্য -- কাজেই তাঁর সিদ্ধান্ত এখন থেকে আমাদেরও সিদ্ধান্ত। দাবী যদি আজকেই পূরণ না হয়, কাল যখন সি.এম.ডি. আসবেন আমাদের সবাইকে এখানে অনশন ধর্মঘটে পাবেন।"

তালি পড়ল জোরদার। সাবাস, কি দারূণ বলল। কিন্তু এবার ?

বরুণদা এসে কানের কাছে বললেন "ফোন করে দেখ্‌তো ডি. জি. এম. আছে কিনা।" আমি ভিতরে চলে এলাম। রাজীব তার ভাষণ চালিয়ে যাচ্ছিল।

ডি. জি. এম. নেই। মিটিংএ। আজকেই ফিরবে দুপুরের ফ্লাইটে। বাইরে আবহাওয়া বেশ গরম হয়ে উঠেছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই একসাথে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল, টিফিনের সময় গেট মিটিং হবে, স্লোগানবাজি হবে। আপাতত বড়বাবুকে খবরটা দিয়ে রাখা আর চীফ ম্যানেজারের সাথে কথা বলা।

চীফ ম্যানেজার মেহরোত্রা, দেখি মুখ ব্যাজার করে বসে আছে।

— এরকম বসে থাকলে কী করে চলবে স্যার ?

— আজ এই প্রোগ্রামটা না করলে চলছিল না ?

— আপনারই দোষ।

— আমার ?

— আপনিই তো চীফ ম্যানেজার ! ক্ষমা চাওয়া চাওয়ির ব্যাপারটা ছাড়ুন। অন্ততঃ ওর প্রভিডেন্ট ফান্ডের হিসেবে গরমিলটাতো শুধরে দিলে পারতেন। ছমাস হয়ে গেল চিঠি দিয়েছি। দু' দুটো রিমাইন্ডার দিয়েছি ...

— ওতো ... ব্যাঙ্কের কর্মচারী। মার্জারের পর আমাদের ব্যাঙ্কে এসেছে। ওদের পি. এফ.এর হিসেব হেড অফিসেই হবে। আমি কি করব?

— এক্ষুনি ফোন করুন। বলুন এই অবস্থা। আজকেই যে করে হোক সঠিক হিসেবটা করে পাঠাতে।

চীফ ম্যানেজার ফোন ঘোরালো। ভাগ্যিস পি. এফ. এর লাইনটা সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া গেল। পি.এফ. এর এ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজারের সাথে কথা বলছিলো মিনমিন করে -- রাজীব ঘুরে গিয়ে ফোনের পাশে দাঁড়াল।

— ছাড়বেন না। আমি কথা বলব।

— (ফোনে হাতটা রেখে) কি কথা ?

— তামাশা করছেন ? যা আপনি বলছেন সেই কথাই। (হেসে) ঘাবড়াবেন না, আপনার পজিশন ফলস্ করব না।

— (ফোনে) স্যার আমাদের রাজীববাবু একটু কথা বলতে চান।

— (ফোনটা প্রায় কেড়ে নিয়ে) নমস্কার স্যার। আমি রাজীব চৌধুরী

বলছি ...। হ্যাঁ, আপাতত জেনারেল সেক্রেটারী। আপনার মনে আছে কিনা জানিনা এক মাস আগে শক্তিদা মানে শক্তি সেনগুপ্ত, আমাদের অল ইন্ডিয়ার জয়েন্ট্ সেক্রেটারীর সাথে... যাক মনে রেখেছেন তাহলে। এই ব্যাপারটা কিন্তু সেদিনই বলেছিলাম। প্রত্যেক মাসের স্টেটমেন্টের ফটোকপি দিয়ে এসেছিলাম ... তা এখনো হলনা কেন ?... দেখুন স্যার। কাল আপনাদের সি.এম.ডি. এখানে আসছেন। যদি সে সময় এরকম একটা দৃশ্য আপনারা না চান যে উনি ঢোকার মুখে দেখলেন আমরা ব্যাঙ্কের গেটে অনশনে বসে আছি আর স্লোগান দিচ্ছি, তাহলে আজই যেমন করে হোক মানসী দেবীর পি. এফ. এর. হিসেবে গরমিলটা শুধরে এখানে পাঠিয়ে দিন ...। ফোনটা রাখছি। না...না... কোনো ওজর নয়। (ফোনটা রেখে) বরুণদা, শক্তিদার নম্বরটা দিন তো ! আমি ডাইরি ছেড়ে এসেছি।

বরুণদা নম্বরটা বললেন। চীফ ম্যানেজারকেই রাজীব বলল নম্বরটা লাগিয়ে দিতে।

— ইউনিয়নের ট্রাঙ্ককল ব্যাঙ্কের ফোনে ...

বলতে গিয়েই বুঝলো ভুল করে ফেলেছে। রাজীবের চেহারা পাল্টে গেল কিন্তু সামলে নিল।

— অন্য সময় হলে শুনিয়ে দিতাম রিকগ্নাইজড ইউনিয়নের শুধু বড় নেতা নয়, চুনো পুঁটি নেতারাও আপনার এবং আপনার অফিসারদের কল্যিণে দিনে কতবার কত জায়গায় ফোন করে। আপাততঃ গরজটা যত আমাদের ততটাই আপনাদেরও। ফোনটা লাগান।

— আমি কাউকে বাইরের কল করতে দিইনা।

— দেন না। চোখ বন্ধ করে থাকেন। হয়ে যায়।

— আমি...

— কথা বাড়াবেন না, দিন, আমাকেই দিন, লাগাচ্ছি ।

শক্তি সেনগুপ্তকেও, ভাগ্য ভালো যে পাওয়া গেল । রাজীব পুরো ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিল।

— বিকেলে আপনি নিজেও কিন্তু ফোন করবেন যেমন করে হোক। আপনার মুখে শুনতে চাই যে কাজটা হয়ে গেছে।

দুপুরের ফ্লাইটে ডি.জি.এম. ফিরে আসাতে তার সাথে কথা হল। সাবধানের মার নেই । এত বলার পরেও যদি কাজগুলো না হয় ? কথা রইল যে তাহলে জোনের প্রধান হিসেবে তিনিই মানসীকে আশ্বস্ত করবেন যে এক সপ্তাহের মধ্যে দুটো কাজই হয়ে যাবে । কমলালেবুর রস দিয়ে অনশন ফেরৎ নেওয়াবেন। আর যদি না করেন ? তাহলে সি. এম. ডি. র সামনে আমাদের সবাইকে অনশনে পাবেন ।

সন্ধ্যে সাতটায় অনশন ভাঙল । তার আগে শক্তিদার ফোন এসেছিল। সাক্ষী হিসেবে মালতীদিকে ডেকে ফোনে কথা বলিয়ে দিয়েছিলাম — পি.এফ. এর কাজটা হয়ে গেছে, আজই ডেসপ্যাচ করিয়ে দিয়েছেন । প্রভূনাথ চৌধুরির কথার কোনো সাক্ষী নেই, কোনো কেস তৈরি হয়না আর ভদ্রলোক সত্যিই অভদ্র কোনো ইঙ্গিত দিয়ে কথাটা বলেননি। এসব কথা মালতীদিকেই বুঝিয়ে তাঁকে কাজে লাগাতে হল । বাইরে এসে মানসীকে ফলের রস প্রভুনাথ চৌধুরীই দিলেন । জয়ধ্বনি হল ।

রাত হয়ে গেছে । মানসীকে বাড়ি ফিরতে হবে একা । রাজীব আমাকে বলল পৌঁছে দিতে ।

— প্রভূনাথবাবুর কথায় তুমি কেন এত মাইন্ড করেছিলে বলো

তো?

কোনো জবাব নেই ।

— আমরা বার বার ওনার সাথে কথা বলেছি । একবারও কিন্তু ওনার কথায় দু'রকম কোনো ভাব পাইনি !

কোনো জবাব নেই ।

— বাড়ীতে তোমার কে কে আছেন ? আসলে কখনো এসব নিয়ে আমি কথা বলিনি তো । হয়ত রাজীবরা জানে। তোমার পরিবার, মা বাবা ভাই বোন.....

কোনো জবাব নেই । শুধু গলির ভিতর ঢুকতে আস্তে বলল "একটু দেখে আসবেন। অন্ধকার । দু'এক জায়গায় পাথর বেরিয়ে রয়েছে ।"

বলতে বলতে ঠিক যেখানটায় হুমড়ি খেয়ে পড়ছিলাম সেখানেই মানসী বাঁদিকে দু ধাপ সিঁড়ি ঠাহর করে উঠে গিয়ে কড়া নাড়ল।

দরজা খুলে দিল এক সদ্য যুবতী শামলা মেয়ে । আমি ফিরবার উদ্যোগ করলাম।

— যাই ?

— এক কাপ চা খেয়ে যাবেন না ?

চায়ের ইচ্ছে না থাকলেও মানসীর ঘরটা একটু দেখার ইচ্ছে ছিল। তাই ভিতরে ঢুকে খাটের ওপর বসলাম। মানসী নিজেই ভিতরে গেল চা করতে। একটু পরে টাক পড়া একজন ফর্সা লোক, পরণে লুঙ্গী আর গেঞ্জী, ভিতর থেকে বাইরের ঘরে এসে আমায় নমস্কার করল। ইনি আবার কে!

— নমস্কার ! আপনি...

— আমি এই দুই বোনের বলতে পারেন লোকাল গার্জেন । রঞ্জিত

শর্মা আমার নাম । আজ এত দেরী হল কেন ?

পুরো ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললাম ।

— তা আমার তো মনে হয় ওই প্রভুনাথ না কি, ও অভদ্র ইঙ্গিত দিয়েই বলেছে । তা আপনারা যখন বলছেন বলেনি ... তো তাতে অনশন করে বসল ? ......আপনাদের ট্রেড ইউনিয়নের ব্যাপার স্যাপার । কত টাকা আছে ওর পি. এফ. এ ?

— আপনি কোথায় কাজ করেন রঞ্জিতবাবু ?

— আমি ? বেকার । আপনাদের ভাষায় ।

— মানে ?

— মানে বেকার । চাকরী করতাম পুলিস ডিপার্টমেন্টে। কেস চলছে সরকারের সাথে ।

মানসী চা নিয়ে ঢুকল । প্লেটে দুটো বিস্কুট আর নিমকি । রঞ্জিত শর্মা কেমন অদ্ভুত গলায় প্রশ্ন করল, " একটু মিষ্টি আনতে পারলে না ফেরার সময়? ভদ্রলোক এত দূর থেকে তোমায় পৌঁছোতে এলেন !"

মানসী তীব্র দৃষ্টি হানল তার ভালো চোখটা দিয়ে। তাতেই দেখলাম জলে ভিজে আছে চোখ । কাঁদছিল? কেন?

রঞ্জিত শর্মা উঠে পড়ল ।

— নিন খান। আপনারা কথা বলুন। আমি একটু ভিতরে যাই।...

— সত্যি, কিছু মিষ্টি দিতে পারলাম না । মা পাঠিয়েছিল তিসির নাড়ু । খাবেন ?

— না বলতে যাচ্ছিলাম । এমন করে বলল, না বলতে পারলাম না । মানসী গিয়ে ভিতর থেকে নাড়ু নিয়ে এল বোয়াম সুদ্ধ । দুটো বার

করে দিল।

গলির মোড় অব্দি এগিয়ে এসেছিল মানসী । রাস্তার আলোর নিচে দাঁড়িয়ে হঠাৎ প্রশ্ন করল, "আচ্ছা সুমনদা, আমার পি.এফ. এ মায়ের নাম দেওয়া আছে নমিনিতে । আমি মরে গেলে টাকাটা উনি পাবেন তো ?"

মরার কথা শুনে চোখ পড়ল ওর শরীরে । ইষৎ ভরা শরীরটা এখন কেন জানি মনে হল জলে ফাঁপা।

— এরকম কথা বলছ কেন ? আর তোমার ছোট বোনের নাম দাওনি কেন ? বিয়ে হলে না হয় বদলে দিতে ! মায়ের বয়স কত হবে এখন ?

— ও সব কথা ছাড়ুন । মাকে আপনারা পাইয়ে দেবেন । কথা দিন ।

— এতে কথা দেওয়ার কি আছে ? উনিতো পাবেনই । তবে তুমি এত সব ভাবছ কেন ?

— কিছু না । ...

হঠাৎ মুখটা তুলে দূরের রাস্তার দিকে তাকাল ।

— আমি বেশী দিন বাঁচবোনা ।

— কি ?

— আমাকে মেরে ফেলবে ।

— কে ?

— প্রভূনাথবাবুকে বলবেন আমায় ক্ষমা করে দিতে । আমি জানি উনি কিছু ভেবে বলেননি কথাটা । কিন্তু এমন ভাবে বেঁচে আছি ! ... চলি।

— মানসী !

শুনলনা । পা চালিয়ে গলির অন্ধকারে ঢুকে গেল । ঠাহর করে দেখলাম ওর দরজায় দাঁড়িয়ে দুটো চোখ আমাদের দেখছিল, আমি চোখ তুলে তাকাতে সরে গেল ।

যা ভাবছি তা কি বলব রাজীবকে ? না, বলবনা ? মানসী হয়ত ভুল ভাবছেনা। প্ল্যানটা পরিষ্কার । কিন্তু কী করা যায়? লোভের এই পুরোনো ছকটা এত মোক্ষম ! আর আমরা অসহায় ! ভাবতে ভাবতে বাড়ির পথ ধরলাম ।

কম্যুনিষ্টের স্বর্গারোহণ

এই সেদিন কথা হচ্ছিল জ্যোতি বসুকে প্রধানমন্ত্রীত্বের প্রস্তাব দেওয়ার ঘটনাটা নিয়ে । খবরের কাগজে সি. পি. আই (এম) এর সেন্ট্রাল কমিটির সিদ্ধান্ত এসে গেছে যে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে । এটাও খবর যে এটা সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্ত হলেও সংখ্যালঘুদের মধ্যে হেভিওয়েট নেতারা ছিলেন।

তিনটে বেজেছে । লাঞ্চের পর চা' টা বেশ আরামে খাওয়া যায়। সঙ্গে অন্য ইউনিয়নের সুজিত আর অফিসার রবীন্দ্রও জুটে গিয়েছিল । সুজিতই তুললো কথাটা । পরিবার পুরোনো সোশ্যালিষ্ট ক্যাম্পের সমর্থক হলেও জাতে কায়স্থ, কাজেই এখন ভারতীয় জনতা পার্টি। তবে এমনিতে ভালো, ক্রিকিশ নয় । ইউনিয়নের কাজে থাকে না তবে ব্যাঙ্কে ভালো সিরিয়ার কর্মী হিসেবে সুনাম আছে । পারিবারিক কিছু সমস্যার কারণে অফিসারের পরীক্ষায় পাশ করেও বাইরে পোস্টিং এর ভয়ে যায়নি।

— কম্যুনিষ্টরা রাজনীতি ছাড়া কিছু দেখতেই পায় না, তাইনা ? ন্যাশনাল ইন্টারেস্ট বলেও তো একটা কিছু আছে ! সব পার্টি মিলে ডাকল তবুও এরা যেতে দিলনা জ্যোতিবাবুকে ! লাভটা কি হল ? নিজের পায়েই নিজে কুড়ুল মারল! বছরের পর বছর ধরে তো ওই বেঙ্গল আর কেরল। আর ত্রিপুরা । সত্যি যদি জ্যোতিবাবুর সরকার বেঙ্গলে ভালো কাজ করে থাকে তো সে কাজের কিছুটাও তো অন্ততঃ সারা দেশ দেখতে পেত! সুখ্যাতিই করত! বরুণদা, আপনি কি বলেন ?

— কম্যুনিষ্ট পার্টি তো নিজের প্রোগ্রাম মেনে চলে ! আর প্রোগ্রাম

কি নির্দেশ দিচ্ছে তার ভিত্তিতেই কেন্দ্রীয় কমিটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

— আপনি তো জানেন প্রোগ্রাম কি বলে। বলুন না আমরাও একটু শুনি।

— প্রোগ্রাম অনেক কিছু বলে সে সব শুনে তুমি কি করবে। মোদ্দা কথাটা হল পার্টি সেই সরকারেই শামিল হবে যে সরকারের নীতিতে, কাজকর্মে পার্টি ফলপ্রসু প্রভাব ফেলতে পারবে। ব্যস, এইটুকুই ধরো।

— তা প্রধানমন্ত্রীর পোস্টটা তো বিরাট গুরুত্বপুর্ণ। তাতে প্রভাব ফেলা যেত না?

— নিশ্চই যেতনা বলেই ভাবছে পার্টি। তাই তেমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

— আচ্ছা আপনি কি সমর্থন করেন এই লাইন?

— আমার তো ঠিকই মনে হচ্ছে ভাই।

মনে হল ইচ্ছে করে বরুণদা একটু ঢিল দিয়ে রাখলেন।

— ব্যস হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলে দিলেন। দেশে একটা নতুন আশা জাগত তা আপনারা দেখতেই পেলেন না। ... আপনাদের বাঙলা ভাষাতেই বলে 'ঢেঁকি স্বর্গে গিয়েও ধান ভানে'। আর কম্যুনিষ্ট স্বর্গে গিয়েও শ্রেণী সংগ্রাম খুঁজবে ...।

এরই মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়ল অবধেশ।

— ছাড়ুন ওসব কথা। কম্যুনিষ্টের স্বর্গারোহণ নিয়ে সত্যি একটা গল্প আছে শুনুন।

"... এক কম্যুনিষ্ট মারা গেল।

চিত্রগুপ্ত মশাই লোকটির খাতা খতিয়ান বার করে মহা ফাঁপরে

পড়লেন। কোনো সুরাহা করতে না পেরে নিজের রেজিস্টার নিয়ে পৌঁছোলেন যমরাজের কাছে।

— হুজুর। ধর্মরাজ।

— বল চিত্রগুপ্ত, কি খবর?

— মুশকিলে পড়েছি হুজুর।

— কি হয়েছে?

— একটা বিচিত্র লোক মারা গেছে।

— তার মানে? বিচিত্র আবার কি? সমস্ত পৃথিবীর মানুষের হিসেব তোমার কাছে। বাইরে থেকে তো আর টপকায় নি।

— না, তা না হুজুর।

— তবে? লোকটা কি সন্ন্যাসী? নাগাবাবা, কাপালিক, উদ্ভট বিদ্যার অধিকারী .....

— না হুজুর, ও তো ইশ্বরের অস্তিত্বেই বিশ্বাস করতো না। কম্যুনিষ্ট বলে ডাকে মর্ত্যের মানুষেরা।

— দেবতাদের অস্তিত্ব না কি সর্ব শক্তিমান ব্রহ্মের অস্তিত্ব? দেবতাদের অস্তিত্বে কিন্তু অনেক ভগত সন্ন্যাসীর বিশ্বাস নেই।

— না হুজুর কোনো রকম ইশ্বর, ব্রহ্ম এমন কি আমাকে বা আপনাকেও মানত না।

— সে কি? আমাকেও না? তাহলে দেখছ কি? কুম্ভীপাক নরকে নিক্ষেপ করো ওকে এক্ষুনি।

— কি করে করবো হুজুর?

— কেন? ওর শিরেও কি কোনো দেবতার বরহস্ত আছে না কি?

— না, তা নেই। সব দেবতারই চক্ষুশূল ব্যাটা।

— তবে ?

— একটা নিয়মনীতি আছে তো আপনার রাজত্বে ! কোনো খারাপ কাজ করলে তবে তো নরকবাস দেব।

— যমে, ইশ্বরে বিশ্বাস করেনা, এটা খারাপ নয় তোমার চোখে ?

— হ্যাঁ খারাপ। খুব খারাপ। কিন্তু বাকিটা ? এই দেখুন (খাতা খুলে দেখালেন) সারাটা জীবন ওর কেটেছে ভালো কাজে, যাকে বলে সন্তের মত মহৎএর সাধনায়।

যম খাতা দেখতে থাকলেন। দেখতে দেখতে ভ্রূ কুঞ্চিত হল। চোয়াল শক্ত হল।

— বিপজ্জনক লোক। হুম্‌ম। নিজের ন্যায়ের দাঁড়িপাল্লার দিকে তাকালেন। একটা মাছি বসে ডানদিক নুইয়ে দিচ্ছিল। হাত নেড়ে ওটাকে ভাগালেন।

— একে স্বর্গে রাখা যাবে না। কেননা ইশ্বরে বিশ্বাস করে না। একে নরকেও পাঠানো যাবে না। কেননা সারা জীবন ভালো কাজ করেছে। কি করা যায় ?

একটু পরে মাথা তুলে তাকালেন। নিজের বিশ্বস্ত রক্ষীকে ডাকলেন।

— তুমিই সেদিন প্রাতঃভ্রমণে আমার সাথে ছিলেনা ? যেদিন নরকের একটা অংশের কর্মচারী জল্লাদেরা নালিশ জানাতে এসেছিল যে 'করাতে চেরা শাস্তি' বিভাগের দেয়ালটা ধ্বসে পড়েছে ?

— আজ্ঞে !

— সেদিন স্বর্গদ্বারের উত্তর দিকে, যেখানে স্বর্গ আর নরকের প্রাচীর একটা গিরিখাতের মধ্যে দিয়ে গেছে সেখানে একটা পরিত্যক্ত কারাগার দেখেছিলাম। জায়গাটা নরকের মধ্যে পড়ে কিন্তু স্বর্গের অন্তর্ভূক্ত করার আদেশ জারি করেছি। এও বলেছি ওখানে নতুন ভবন তৈরি হবে। নতুন দেব দেবীদের অনেকে, পরিবার বেড়ে যাওয়ায় বড় বাসস্থান চাইছেন।

— আজ্ঞে।

— হ্যাঁ ! তা ওটা স্থগিত থাক এখন। চিত্রগুপ্ত, এই লোকটিকে ওই পরিত্যক্ত বাড়ীতে জায়গা দাও। ওটা এখন স্বর্গও নয় নরকও নয়, মাঝামাঝি যাকে বলে। (রক্ষীর দিকে তাকিয়ে বললেন) তোমার কোনো কড়া ধাঁচের সহকর্মীকে ওখানে পাহারা দিতে বলবে। মাঝে মধ্যে আমি নিজে গিয়ে খবর নেব ব্যাটা কেমন আছে।

রক্ষী ফিরে এসে খবর দিল কেউ ওর সঙ্গে থাকতে চাইছেনা। সবাই ভয় পেয়ে গেছে, কম্যুনিষ্ট খুব বিপজ্জনক জীব হয়। যমরাজ রেগে বললেন "তাহলে তুমিই গিয়ে থাকো। লজ্জা করেনা ? যমের অনুচরেরা কোনো মানুষকে ভয় পাবে আর তা তুমি বলতে এসেছ ?"

অগত্যা সেই রক্ষীই থাকতে শুরু করল ওই পোড়োবাড়িতে কম্যুনিষ্টের পাহারায়।

প্রায় একমাস কেটে গেছে। যমরাজ নানা কাজে ব্যস্ত থাকেন, ওদিকে আর যাওয়া হয়ে ওঠেনা। সেদিন হঠাৎ করেই মনে পড়ল লোকটির কথা। ভোরবেলায় প্রাতঃ ভ্রমণে বেরিয়ে গেলেন পোড়োবাড়িটার কাছে। দেখলেন সেই রক্ষী বাইরে দাঁতন করছে। ভিতরে পায়ে বেড়ী পরে নরকের দিকে তাকিয়ে বিপজ্জনক লোকটি বসে আছে। যাক শাস্তির

ব্যাবস্থা ভালোই হয়েছে নাস্তিকতার অপরাধে। ন্যায়রক্ষাও হয়েছে। নরক থেকে একশো গজ পেছিয়ে। স্বর্গের শেষ ভবন থেকে দেড়শো গজ এগিয়ে।

— কি হে রক্ষী ? কেমন আছো ?

— প্রণাম ধর্মরাজ। আসতে আজ্ঞা হোক।

— কেমন আছে তোমার বন্দী ? কোনো ঝামেলা করছেনা তো?

— কি যে বলেন কমরেড ! ও তো দারুণ লোক। দুজনেই আছি আমরা ফার্স্ট ক্লাশ !

বহতী গঙ্গা

জেনারেল সেক্রেটারী পদে রাজীবের নির্বাচিত হওয়াটাও একটা গল্প বটে।

রাজীব, মানে রাজীব চৌধুরি আমার থেকে একটু সিনিয়র। দশ রকম সাংস্কৃতিক কাজকর্মের সাথে জড়িয়ে থাকে। ওসব ব্যাঙ্কের বাইরের ব্যাপার। মাঝে মধ্যে খবরের কাগজ বা ওর বিলি করা ফোল্ডার ইত্যাদির মাধ্যমে জানতে পারি। বলতে গেলে ট্রেড ইউনিয়নের লোকই নয়। নাটকের লোক। মানে প্রাথমিক ভাবে ওই জগতের লোক। সুদর্শন। স্মার্ট। স্টাইলিশ। নাটকের গ্রুপের সাথে শুধু ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নয়, কুড়ি বছর ধরে সদস্য - ফাউন্ডার মেম্বার — যদিও এখন রোববারে আড্ডা দিতেও আর যাওয়া হয় না। ওর গ্রুপের ডিরেক্টর কুণালজী এখনও ব্যাঙ্কে এলে বরুণদাকে বলেন "আপনারা আমার ডান হাত আমার কাছ থেকে কেড়ে নিলেন। কে জানে কেমন আপনাদের ক্যাডার-পলিসি।" শেষ শব্দ দুটোর স্পষ্ট শ্লেষ বরুণদা বুঝতে পারেন।

রাজীবের আগে ছিলো মণি ভূষণ সহায়। জেনারেল সেক্রেটারী পদে থাকাকালীন আবেদন করলো স্পেশাল এসিস্টেন্টের ভ্যাকেন্সীতে। সিনিয়রিটি অনুসারে পোস্টিং হল হাজিপুরের কাছে একটা ব্রাঞ্চে। ইউনিয়নের সদস্য আরেকজন, ঘনশ্যাম রাউত, তারও পোস্টিং হল ওই হাজিপুরেরই কাছে অন্য আরেকটা ব্রাঞ্চে। সে মণিভূষণের থেকে সিনিয়র।

গঙ্গাপুলের একটা লেন তদ্দিনে খুলে গিয়েছিল, কাজেই হাজিপুর যাওয়া আসা আর বিশেষ অসুবিধেজনক ছিল না। গঙ্গার এপার ওপার আসা যাওয়া করতে করতে মণিভূষণ ইউনিয়নের কাজ মোটামুটি ভালোই

চালাচ্ছিলো। ফাঁকগুলো ভরাট করে রাখার জন্য আমরা ছিলাম, সিনিয়র নেতারাও ছিলেন।

গোল বাঁধলো পাটনায় ট্রান্সফার নিয়ে। মণিভূষণ ও ঘনশ্যাম একই দিনে আবেদন করলো। ম্যানেজারকে দিয়ে ফরোয়ার্ড করিয়ে ঘনশ্যাম নিজের আবেদনের খামটা নিজের জি. এস., মণিভূষণের হাতে দিয়ে দিলো। "তুমি তো যাবেই, আমারটাও জমা করে দিও।"

কবে আবেদন জমা পড়ল আমরা কিছুই জানতাম না। এমনকি রাজীব, যে মণিভূষণের খুবই ঘনিষ্ঠ ও প্রিয়পাত্র ছিল—লোকে বলত 'হরিহরাত্মা'—সেও জানতনা।

হঠাৎ একদিন তিনটে ট্রান্সফার হল পাটনায়। আশ্চর্য যে এটাও আমাদের কাছে খবর হল। নইলে ট্রান্সফার ইত্যাদির ব্যাপারে ইউনিয়ন এমনিতেই একটু সচেতন থাকে। রিকগ্‌নাইজড তো বসে আলোচনা করেই। অন্যরা আলোচনা করার লিখিত অধিকার কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে পাক আর না পাক জোরজার করে আলোচনা করেই নেয়। মানে বাধ্য করে তেমন কর্তৃপক্ষ হলে। কিন্তু এই তিনটে ট্রান্সফার হঠাৎ করে হল আর তৃতীয়টা হল মণিভূষণের!

তাহলে ঘনশ্যাম? জানা গেল তার আবেদন জমা পড়েছে পঁচিশ দিন পর।

শুরু হয়ে গেল মহাভারত — ইউনিয়নের ভেতরেই। পাটনা থেকে কলকাতা অব্দি চিঠি চালাচালি, মিটিং, জেনারেল সেক্রেটারীর তুলোধোনা, থুতু গেলার মত করে কর্তৃপক্ষকে বলা যে এটা তাদেরই ভুল, ঘনশ্যামের আবেদন পঁচিশ দিন পরে রেকর্ড করা, কাজেই শোধরাতে হবে

কর্তৃপক্ষকে — মণিভূষণকে ফেরৎ পাঠিয়ে ঘনশ্যাম রাউতকে আনতে হবে...। সেটা হলও। বলতে গেলে নজীর তৈরি হল একটা, কিন্তু সেটা এ কাহিনীর উপজীব্য নয়।

আসলে মণিভূষণ ভাবেইনি ব্যাপারটা এভাবে মোড় নেবে। ভেবেছিল দু' মাস জলঘোলা হবে, পরের ভ্যাকেন্সিতে ঘনশ্যামও চলে আসবে, সম্মেলনের দিন আসতে আসতে সবাই ভুলে যাবে। জেনারেল সেক্রেটারী এটুকু সুবিধে তো নিতেই পারে — নতুন কী?

কিন্তু পরের ট্রান্সফারগুলো হতে দেরী হল। কাজেই ব্যাপারটা গড়ালো। গড়ালো এমন যে মণিভূষণকে জেনারেল সেক্রেটারিশিপ খোয়াতে হল আর তাও রাজীব, মানে নিজের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ লোকটির কাছে ভোটে হেরে!

ভোটের অর্থাৎ সম্মেলনের ডেলিগেট সেশনের আগের রাতে, কর্মালি নেতৃত্ব বদলের এই সিদ্ধান্তটা হওয়ার একটু আগে আমি আর রাজীব একটু বেরিয়েছিলাম। বলা হলনা, সম্মেলন ছিল ধানবাদে। বেরিয়েছিলাম মানে রেল কলোনির মাঠটা পেরিয়ে বাজার হয়ে স্টেশন, তারপর ডানদিকে, স্টেশনের এপার ওপার করার ওভারব্রীজটায় অনেকক্ষণ।

ডিসেম্বরের কুয়াশা আর শীত জেঁকে নামছিল সন্ধ্যার পর থেকেই।

— এই ওভারব্রীজটা আমার এত প্রিয় সুমন! তোর মতো আমারও এই ধানবাদেই চাকরীজীবনের শুরু। সেটা চুয়াত্তর সাল।

রাত প্রায় সাড়ে আটটা — অন্ধকারে ঘড়ির কাঁটা ঠাহর করে বুঝলাম। ব্রীজের ওপর দিয়ে হেঁটে চলা মানুষের সাথে সাইকেল আরোহীও

আছে -- সিঁড়িতে সাইকেল চড়িয়ে আবার নামার সময় সাইকেল বগলদাবা করে নামবে। তবে সংকীর্ণ পথটা যেহেতু পদযাত্রীদের একচেটিয়া তাই সাইকেলের ঘন্টি খুব মিনমিনে স্বরে বাজছে মাঝে মধ্যে। কেউ বিরক্ত হয়ে ঘুরে তাকালেই বিব্রত হয়ে সাইকেল থেকে নেমে পড়ছে আরোহী। চুয়াত্তর সালেও কি এরকমই ভীড় ছিল ?

আমি বুঝলামনা রাজীব কেন ডেকে আনলো আমাকে।

-- তুই কি মণিভূষণের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে কষ্ট পাচ্ছিস ?

-- হুঁ।

-- দাঁড়াতে চাইছিস না !

-- ঠিক তার উল্টো ! চাইছি। নিজেকে মানসিক ভাবে প্রস্তুত করছি নির্মমতার সাথে, এই ইমোশনাল চ্যালেঞ্জটার মোকাবিলা করার জন্য। মানে এটা ইমোশনাল চ্যালেঞ্জই তো -- এতদিনকার গাঢ় বন্ধুত্বের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো!

-- বন্ধুত্বের বিরুদ্ধে তো নয় ! তবে বন্ধুর বিরুদ্ধে।

-- তাই তো হওয়ার কথা। কিন্তু তা যে হচ্ছেনা !

-- তার মানে ?

-- মণিভূষণ যদি স্পষ্ট একটা স্ট্যান্ড নিয়ে নিত যে ও যা করেছে বেশ করেছে -- ঠিক, আমরাই ভুল, তাহলে আমার পক্ষেও আমার স্ট্যান্ডটা নেওয়া সহজ হত হয়ত। কিন্তু ও হঠাৎ স্তিমিত ও চাপা হয়ে গেছে। এতদিন অব্দি আমরা সম্মিলিত ভাবে যা যা সিদ্ধান্ত নিয়েছি সব ও মেনেওছে একের পর এক -- থুতু গিলে কর্তৃপক্ষকে প্রতিবাদ পত্র দেওয়া, মেমোর‍্যান্ডাম দেওয়া, ডেলিগেশন নিয়ে যাওয়া ...

-- সব সব ! সব হয়েছে শুধু কাজটুকু ছাড়া !

-- কিন্তু কাজটাতো জটিল। আর ও কথা দিচ্ছে করাবে।

-- মিথ্যে কথা। শুধু টাইম কিল করছে। ভাবছে পরের লটের ভ্যাকেন্সীতে ঘনশ্যাম রাউতের ট্রান্সফারটা হয়ে গেলেই ওর চালাকির ব্যাপারটা ধামা চাপা পড়ে যাবে। ওসব ছাড় ! তুই শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে চইছিস।

-- ?

-- তুই যতই বল 'প্রস্তুত হচ্ছি' সেটা কোনো ইমোশনাল চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় নয়। ওর অন্যায়টার প্রতি তুই নির্মমভাবে ক্ষমাহীন, এটা মিটিংগুলোয় প্রমাণিত, কাজেই তুই দাঁড়াবি আমি জানি। প্রশ্নটা অন্য জায়গায়। তুই নাটকের দুনিয়ার মানুষ। তোর কি মনে হচ্ছেনা তুই নিজের করণীয় কাজে ক্ষতি করে ইউনিয়নের এই দায়টা ঘাড়ে নিচ্ছিস ?

-- কিন্তু আমি ছাড়া অন্য কেউ দাঁড়ালে ওকে হারানো যাবে না আর তার চেয়েও বড় কথা সংগঠনের ভাবমুর্তিটাকে পরিচ্ছন্ন করা যাবে না। মুখে কেউ বলুক আর না বলুক, সবাই জানে মণিভূষণ আর আমি দুজনেই ফোরামে আছি।

-- শুধু তোরা দুজনেই তো নয়! তবে তুইই কেন দাঁড়াবি? অন্য কারুর বিষয়ে সংগঠন ভাবুক !

-- আমিই বা নয় কেন ? ব্যক্তিগত ভাবেও ও আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তবে আজ এই প্রশ্নে আমিই নয় কেন ?

-- এই তোর নীতিবাদী গোঁ ! কেমন আর্টের প্রতি কমিটমেন্ট তোর কে জানে।

-- কি করব ? একটা বিচ্ছিরি হাসি ছাড়ল রাজীব । মানে আমার জন্য বিচ্ছিরি। যখনই আমাকে ওর মনে করাতে হয় যে আমি ওর থেকে বয়সে একটু ছোট, হয়ত অভিজ্ঞতায় অনেকটা ছোট, তখনই এই হাসিটা ছাড়ে।

-- কি করব বল ? একটাই যে জীবন আমার । আর সেটা এই মাটির !

-- তার মানে ?

-- ছাড় ওসব । বলতে পারিস আমি এই সব কিছুকে জীবন থেকে শেখার আর দেখার একটা জরুরী পর্য্যায় হিসেবে দেখি ।

-- তার জন্য কি ওই প্রধান পদটাতে যাওয়া দরকার ? ওতে তো এত ব্যস্ত হয়ে পড়বি যে নাটকে তোকে আর খুঁজেই পাওয়া যাবে না ।

-- এখন তো আর দরকারের প্রশ্ন নেই । এখন এটা প্রায় সিদ্ধান্ত।

-- সিদ্ধান্তে নিজেকে খাপ খাওয়াচ্ছিস, মনের স্বাভাবিক টানাপোড়েনগুলোকে দাবিয়ে ?

-- তুই হলে কি করতিস ?

-- আমি স্পষ্ট বলে দিতাম এটা আমার কাজ নয়। আমি পারবো না। অন্য কারুর কথা ভাবা হোক। আমিও কারো নাম প্রস্তাব করতে পারি। সে ফোরামের হোক অথবা বাইরের, কিছু আসে যায়না । লোকটি ভালো হলেই হল। মণিভূষণকে বদলে অন্য কাউকে নিয়ে আসা এবং তারপর উঠে পড়ে লেগে ট্রান্সফারের ব্যাপারটা সেট রাইট করা নিয়ে কথা। সংগঠন মণিভূষণকে শাস্তি দিল, ইস্যুটাকে ঠিক ভাবে সেটল করল, লোকে দেখবে না? সংগঠনের ভাবমূর্ত্তি পরিচ্ছন্ন হবে না ?... আসলে আমার মনে হয়

তোর একটা প্রচ্ছন্ন অহঙ্কার আছে, ওর ঘনিষ্ঠ বন্ধু বলে ব্যক্তিগত ভাবমূর্তি নিয়ে বেশী চিন্তিত। অথবা মোহ! অর্থের বা যশের নয়, ক্ষমতার স্বাদের মোহ -- যে এই সুযোগে ওই পদে পৌঁছে দেখি কাজের চ্যালেঞ্জটা কিরকম।

-- ফালতু বকছিস। রাত হয়েছে । ওরা খুঁজছে নিশ্চই । চল ফেরা যাক ।

সম্মেলনের পর পাটনায় ফিরে এসে দু চারদিন ডি. জি. এমের সাথে ক্লোজডোর শলাপরামর্শ হল । গোপন ভাবে চিঠি বেরুলো দুটো । একটা মণিভূষণের ব্রাঞ্চে যাবে পাটনায়, নিয়ে যাবে বরুণদা । আরেকটা চিঠি ঘনশ্যাম রাউতের ব্রাঞ্চে যাবে, হাজিপুরে, নিয়ে যাবে রাজীব, নতুন জেনারেল সেক্রেটারী । আমিও রাজীবের সঙ্গ নিলাম ।

-- ম্যানেজমেন্ট চালাক ! আমাদের হাত দিয়েই কাজটা করালো। অবশ্য ভালোই হল । কাজটা যে আজকেই হয়ে যাবে সেটা নিশ্চিত করা গেল।

-- ঘনশ্যাম আজকেই রিলিভ হবে পাটনার জন্য আর মণিভূষণ আজকেই রিলিভ হবে মহনারের জন্য । দু তিন মাসের ব্যাপার । পরের লটের ভ্যাকেন্সীতে মণিভূষণও পাটনায় চলে আসবে । বাঃ !

-- তাই তো । এইটুকু ব্যাপার । আর এইটুকুর জন্য মণিভূষণটা এক বছর জল ঘোলা করে রাখল । শেষে পোস্ট থেকে সরে যেতে বাধ্য হল।

-- তাও শেষ কামড় দিয়ে । ভোটে যখন অনেকে ব্যাপারটা না বুঝতে পেরে ওর নামও প্রস্তাব করল তখন স্টিয়ারিং কমিটির একজন হিসেবে ওর উচিৎ ছিল নাম ফেরত নিতে বলা, উইথড্র করা । তাতে

করলনা । ভোট করিয়ে ছাড়ল। তাও কি ভোটের ছিরি । দুই বন্ধুর লড়াইয়ের কনফিউজনে আদ্ধেকের বেশী ডেলিগেট হল ছেড়ে বেরিয়ে গেল । ভোট পড়ল তোর পক্ষে সাঁইত্রিশ আর ওর পক্ষে বত্রিশ । তিন ভোট ওদিকে গেলে ও পার্টির সিদ্ধান্তকে হারিয়ে দিত।

-- তেতো করে ছাড়ল পুরো ব্যাপারটা । তবু ওকে ডেকে ডেকে রাখতে হবে কাজে কর্মে । ক্ষমতা তো আছেই । ড্যাশিংও সেরকম । কি ভেবেছিলাম আমরা ! অনেকদিন থাকবে । এক টার্মে গেল । ওভারস্মার্টরা যখন ওভারস্টেপ করে তখন এই অবস্থাই হয় ।

-- দাঁড়া... দাঁড়া... দাঁড়া !

-- কি হল !

-- দাঁড়া না একটু ।

স্কুটারটা রাজীবই চালাচ্ছিল । ব্রেক চেপে দাঁড় করালো বাঁদিকের ফুটপাথ ঘেঁষে ।

গঙ্গাপুলের মাঝামাঝি জায়গা। দুপাশে শীতের নদীর অনতিবিস্তৃত পাড়। নীলচে সবুজ জল । ব্রীজের রেলিংয়ে ভর দিয়ে মাথাটা নোয়াতেই, বেলা সাড়ে এগারটার সূর্যের আলোয় আমাদের দুটো মাথার ছায়া পড়ল জলে। পিছনে মুহুর্মুহ এককেটা ট্রাক বাস যাচ্ছে আর ব্রীজটা কেঁপে কেঁপে উঠছে ।

-- দাঁড়াতে বললাম একটু এই নদীবক্ষের দৃশ্যটা দেখার জন্য । একটু হাওয়া খা ! একটা সিগারেট ধরাই ।

-- ঠিক বলেছিস ! মাথাটা গ্যাঞ্জাম হয়ে আছে ।

সিগারেটটা শেষ করে ছুঁড়ে ফেললাম জলে । রাজীব ব্রীজের দিকে

তাকিয়েছিল । আমার দিকে চোখ তুলে হাসল ।

-- বড়বাবু যদি দেখতেন আমাদের, তাহলে এক্ষুনি ধমক দিয়ে বলতেন "তোমাদের এখন হাওয়া খাওয়ার ফুর্ত্তি হয়েছে ? যে কাজটা নিয়েছ সেটা আগে করে আসতে পারলে না ?"

-- তা তো বলতেন । তবে ...

-- হ্যাঁ 'তবে' । আমিও বড়বাবুকে বলতাম 'বড়বাবু, ভারী ভারী ট্রাক গেলে ব্রীজটা কাঁপে কেন জানেন ? কি মনে হয়, ব্রীজটা কি দুর্বল ? ......না বড়বাবু, ওটা ব্রীজের দুর্বলতা নয় । ব্রীজটা গড়াই হয়েছে ওইভাবে যাতে প্রতিটি অংশে কাঁপার জায়গাটুকু থাকে । নইলে ব্রীজটা ধ্বসে যেত। আমাদেরও কাঁপার জায়গা খুঁজে নিতে হয় ।'...

-- তা বড়বাবু তো মনে হয় কাঁপেন না । তাহলে চলেন কি করে?

-- হুঁঃ ! কাঁপেন না আবার !

-- কাঁপেন ?

-- নদীর দৃশ্য দেখে কাঁপেন না, নাটক নভেল পড়েও কাঁপেন না, তবে কাঁপেন !

-- কখন ?

-- যখন দু গ্লাস মাল পেটে পড়ে রাতের মজলিসে । উনি তো আর প্লেজ ভরেননি যে ...

আমি তীক্ষ্ণ ভাবে রাজীবের দিকে তাকালাম । শালা বুঝতে পারছে ওর নাটক করা ভোগে গেল এবার ।

কথাশিল্প

বুধাই সাওয়ের দোকানে তেলেভাজা খাওয়ার সবচেয়ে বড় আকর্ষণ যে ভেজাল নেই । এমনিতে সব ফুটপাতি দোকানেই তিসির তেল তবে বুধাই সাওয়েরটা এক নম্বর, খাঁটি । আর বেসন টাটকা । তার ওপর হাতের জাদু তো আছেই।

আফতাব সাহেবের এই পাপটার কথা জানা ছিলনা । বুড়ো বয়স, হার্টের ওষুধ পকেটে নিয়ে ঘোরেন, সুগারের জন্য রসোগোল্লা ছিবড়ে করে খান অথচ বেধড়ক ঢুকে পড়লেন তেলেভাজার দোকানে ।

— দেখছ কি ? এস ভিতরে এস ।

— আপনি তেলেভাজা খাবেন ?

— তিসির তেলে কোলেস্টেরল থাকেনা তা জানো ? সবচেয়ে সেফ খাবার হল এই ফুটপাথি দোকানের তেলেভাজা — বিশেষ করে সুগার আর হার্টের পেশেন্টদের জন্য ।

— আর পেট খারাপ ?

— ওটা বাঙালীদের একচেটিয়া । পাঠানদের পেটখারাপ হয়না।

— সে তো মেওয়া খায় বলে । তার ওপর খাসির গ্রিল, নারগিসি কাবাব,...

— আজকাল আর খায়না । পূর্ব পুরুষরা এত খেয়েছে যে তোমরা যাকে বলো ওই জেনেটিক কোড না কি, তাতে ঢুকে পড়েছে । মাঝে মধ্যে এখনো ঢেঁকুর ওঠে — তিনশো বছর আগে খাওয়া ভেড়ার ।

কথা বলতে বলতে কখন দোকানে 'ঢোকার মুখে নর্দমার ওপর পাতা কাঠের পাটাতনে দাঁড়িয়ে পড়েছি খেয়াল নেই। পিছন থেকে তাড়া

খেয়ে ভিতরে ঢুকে বসে পড়লাম । বসে পড়লাম মানে আমাদের দেখেই দুজন, লুঙ্গি গেঞ্জী পরা লোক — পাড়ার গ্রাহক হবে বোধহয় — বেঞ্চ খালি করে প্লেট নিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে পড়ল । তাই জায়গা পেলাম বসার।

সঙ্গে দিলীপও ছিল এতক্ষণ, চুপচাপ । আফতাব সাহেবের শিষ্য এবং সাথী । দিলীপ চতুর্বেদী, পূর্বী উত্তর প্রদেশের ব্রাহ্মণ । এতক্ষণে কথা বলল।

— হ্যাঁ খাঁ সাহেব, কি খাবেন বলুন ?

— সবচেয়ে আগে এক একটা করে ফুলকপি আর কাঁচা ছোলার পকোড়া। তার পর বল আলুর পকোড়া গরম গরম ভাজতে — দুটো করে খাব। তারপর দেখা যাবে আর কি খাওয়া যায়।

আমাদের বড়বাবুও বড়বাবু আর আফতাব সাহেবও নিজের ব্যাঙ্কে বড়বাবু তবে দুজনের মধ্যে অনেক তফাৎ । বাকি সব তফাতের কথা থাক, একটা বিরাট তফাৎ হল আমাদের বড়বাবু এক ফোঁটা ভাষণ দিতে পারেননা । দেশ দুনিয়ার খবরে ওনার বিন্দুমাত্র রুচি নেই । শুধু নিজের সংগঠন, সদস্যদের কাজ আর কর্তৃপক্ষের বজ্জাতিগুলোকে ঠিক সময় চেপে ধরা একমাত্র ধ্যান জ্ঞান। আর আফতাব সাহেব সারা রাজ্যের সব ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের মাঝে জনপ্রিয় আমাদের তারকা-নেতা, নামজাদা ফারারি ওরেটর, 'জোশ' এর সাথে 'হোশ' এর এমন 'মিসাল' পেশ করেন যে মঞ্চে বাকি সমস্ত বক্তারা ম্লান হয়ে যায় — তা সে মঞ্চ সুসজ্জিত হল ঘরে হোক অথবা রিকশার পাদানি হোক চৌমাথায়।

আলুর পকোড়া আর পেঁয়াজের পকোড়া একসাথে মিলিয়ে মিলিয়ে খাচ্ছিলাম । গরম বলে ফুঁ দিতে হচ্ছিল বারবার। ১৯৯২ সালের নভেম্বর

মাস — সোভিয়ত ইউনিয়নে সমাজবাদ সদ্য পরাভুত — ইয়েল্‌ত্‌সিনের ১০০ দিনে পুঁজিবাদ ফিরিয়ে আনার কার্য্যক্রম চলছে ।

আফতাব সাহেবের দিকে উদ্বিগ্ন মুখে তাকালাম ।

— ইতিহাসের এত বড় একটা ট্রাজেডির সাক্ষী হয়ে রইলাম আমরা, তাই না আফতাব সাহেব ?

কোনো সাড়া দিলেন না । মন দিয়ে ছোলার ঘুগনি থেকে একটা কালো কিছু বেছে ফেলছিলেন । একটু পরে চোখ তুলে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন তাঁকেই বলছি কিনা কথাটা ।

— আপনারা তো তবুও একটা যুগ দেখেছেন, সৃষ্টির, নির্মাণের । চীন, কিউবা, তার আগে পূর্ব ইওরোপের দেশগুলো।

— সে তোমরাও দেখেছ — ভিয়েতনাম, লাওস, কম্বোডিয়া ।

— আপনাদের যুগের শেষ প্রান্ত টুকু । তার পরেই চীন-ভিয়েতনাম যুদ্ধ, ভিয়েতনাম-কম্বোডিয়া যুদ্ধ ...

— তার মধ্যেও তো আফগানিস্তানে নুর মোহম্মদ তরক্কির নেতৃত্বে...

— সত্যি, এটা কিন্তু প্রচুর আশা জাগিয়েছিল । পুরো ব্যাপারটা কেঁচিয়ে দিল বাবরাক কারমালকে কাঁধে বসিয়ে রুশী ট্যাঙ্কের প্রবেশ । কিছুতেই ভিতর থেকে সমর্থন করতে পারা যায়না ব্যাপারটা...

আফতাব সাহেবের সামনে প্রসঙ্গটা ওঠাবার কারণ অন্য ছিল । সভাসম্মেলনে অসাধারণ বাগ্মীতায় ভাবধারাগত দিকটা সামাল দেন উনিই। শুধু আগে জিজ্ঞেস করে নেন, লাইনটা কি । আবার শেষে জিজ্ঞেস করেন, লাইনে ছিলাম তো। হিন্দী উর্দুর চোস্ত বাক্যবিন্যাসে একটা লড়াকু মনোভাবের জোয়ার সমবেত কর্মচারীদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পারেন।

ব্যাঙ্কের রোজকার ছোটখাটো ইস্যুতো দুরের কথা এমন কি শিল্পস্তরের বড় ইস্যুগুলোরও ব্যাখ্যায় যাননা । ওসব অন্যদের কাজ । কলকাতা, দিল্লীর বড় নেতারা বলেন ইংরেজী অথবা ভাঙা হিন্দী। বাগ্মীতার জাদু শুধু একটা স্তর অব্দি যেতে পারে। লাইন দিলেও বিশেষ মাথায় ঢোকেনা। সেখানে আফতাব সাহেব একেবারে অপ্রতিদ্বন্দ্বী—জনতার নিজের বক্তা— সংগঠনের গৌরব । প্রশ্নটা আমার মাথায় ঘুরছিল যে এবারে আফতার সাহেব কি ভাবে এগোবেন ! সোভিয়েতের পতন তো আর মামুলী ঘটনা নয়! যাকে বলে যুগান্তকারী ! যে যতই সমালোচনা করে থাকুক গত তিরিশ চল্লিশ বছরে, প্রত্যক্ষ পরোক্ষ প্রভাবটা দেখতে তো পাচ্ছি — সব বামপন্থীর মুখ [illegible]লেন। ‘ছুঁয়ে ছুঁয়ে থাকি’ মানবতাবাদীদেরও বলতে গেলে আমতা আমতা করতে হচ্ছে । আর সামনের সপ্তাহেই একটা কনভেনশন ! সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক আসছেন।

*　　　　*　　　　*

কনভেনশনে লোক মোটামুটি ভালোই হয়েছে । আফতাব সাহেব [illegible] করছেন । সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক প্রায় দেড় ঘন্টায় বক্তব্য রাখলেন ইংরেজিতে — তাঁর অননুকরণীয় স্টাইলে । সংবাদ মাধ্যমে বহুল প্রচারিত কিছু শব্দ, শব্দজোট ও বাক্যাংশ অসংলগ্ন ভাবে ছুঁড়ে দেওয়া, যেন একটা কোলাজ তৈরি করা ছেঁড়া খবরের কাগজের টুকরো দিয়ে । তারপর যোগসূত্র গড়ে তোলা ধীরে ধীরে— ইষৎ তির্যক বাক্যবিন্যাসে। যারা বুঝছিল তারা মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনছিল। যারা বুঝছিলনা তারাও বড় নেতার [illegible] কাটছিল। ঝুঁকি বুঝে তিনি আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির কথা তুললেনই না । কেবল জাতীয় অর্থনীতি শিল্পনীতি ভবিষ্যৎ সংগ্রাম নিয়েই গড়ে তুললেন

নিজের বক্তৃতা। অন্য কেউ হলে এত গুরুগম্ভীর বুদ্ধিদীপ্তি লোকে খেত না । কিন্তু এ মানুষটিকে সবাই চল্লিশ বছর ধরে চেনে । জানে যে হাওয়াবাজি নয়, গভীর ইনভলভ্‌মেন্ট আর লড়াইয়ের মানসিকতা থেকে কথাগুলো বেরুচ্ছে।

বক্তব্য শেষ করার ঠিক তিন লাইন আগে সোভিয়েত পরিস্থিতির দিকে ইশারা করে বললেন, 'ঘটনাবলী গভীর বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। তবে আমি, বলতে কোনো দ্বিধা নেই যে আমি আজও একজন মার্ক্সিষ্ট। আর মার্ক্সিষ্ট হিসেবে আমি অত্যন্ত বিচলিত ....।' ব্যস শেষ করে দিলেন। এটা কি হল ?

সভাঘরে সবাই অস্তস্তিতে রইল যে তাদের প্রিয় নেতা প্রসঙ্গটা এড়িয়ে গেলেন । এবার আফতাব সাহেবের হাতে উপসংহার, সভাপতি হিসেবে।

আফতাব সাহেব ধীরে সুস্থে উঠে মাইকের সামনে এলেন । ডান হাতটা পেটের ওপর আলতো ভাবে ঘোরা শুরু করল।

"আমি জানি আপনারা প্রতীক্ষায় আছেন যে আমি কোত্থেকে থেকে শুরু করি । শুধু আপনারা কেন আমাদের শত্রুরাও -- ওই মুষ্ঠিমেয় ধনকুবের যারা কোটি কোটি শ্রমজীবী মানুষের স্বপ্নের ধ্বংস দেখে আজ উল্লসিত -- তারা প্রতীক্ষায় রয়েছে, রূদ্ধশ্বাসে কান পেতে শুনতে চাইছে যে আমরা কি বলি। সোভিয়েতের ঘটনাবলী বলতে গিয়ে আমরা বিচলিত হই কিনা । হ্যাঁ আমরা বিচলিত । অবশ্যই আমরা বিচলিত । মীর বলেছিলেন ঃ--

পসে নামূসে ইশ্‌ক থা ওয়র্না

কিত্‌নে আঁসু পলক তক আয়ে থে
অব জাঁ আফতাব মে হম হ্যাঁয়
ওয়াঁ কভূ সর্‌-ও-গুল কে সায়ে থে ।

"হ্যাঁ ! চোখের জল চোখ অব্দি উঠে এলেও তা বেরুবে না । জানি, যে খাড়া রোদ্দুরে আজ আমরা দাঁড়িয়ে, কাল এখানে বৃক্ষ ও ফুলের ছায়া ছিল। শ্রমিক কৃষক শ্রমজীবী জনতার রাজত্বের বৃক্ষরাজি ছিল, তাতে গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল ফুটেছিল মানবতার । তার ছায়া ছিল আমাদের মাথার ওপর । আজ নেই। কে ছিনিয়ে নিল ? না, শত্রুদের দোষ দেবনা । তারা তো সত্তর বছর ধরে অস্ত্র উঁচিয়েছিল । তারা তো মরীয়া হয়ে ছিল যে যেমন করে হোক দুনিয়ার গরিব জনতার চোখ থেকে এই স্বপ্নময় বাস্তবটা মুছে যাক । ছিনিয়ে নিল যারা, তারা শত্রু নয়, আমাদেরই ভাই । আমাদেরই অগ্রণী শক্তি, সোভিয়েতের প্রহরার দায় যাদের ওপর ছিল সেই কমিউনিষ্ট পার্টি, সোভিয়েত ইউনিয়নে তাদের সরকার। তাই তাদের বিপথগামিতার আমরা কাঁদতেও পারি না । কেন না ইশ্‌কের ইজ্জত, ভালোবাসার সম্মান রাখার দায় রয়েছে কাঁধের ওপর । বিপ্লবকে ভালোবাসার, মানবতার স্বপ্নকে ভালোবাসার মান সম্মান বাঁচিয়ে রাখার দায় আমাদেরই ওপর । তাই চোখ শুকনো। হ্যাঁ আমরা বিচলিত । কেন আপনারা বিচলিত নন ? কে বিচলিত নয় ? যে কেউ অন্যায় অবিচার আর শোষণের এই দুনিয়া থেকে মুক্তির একটা স্বপ্ন আঁকড়ে ধরে সেদিকে এগোতে চায় তারা সবাই বিচলিত। এই বিচলন আজ একটি মানুষের ভিতর মানবতার সবচেয়ে বড় লক্ষণ --

"তা বলে মুষড়ে পড়িনি একটুও । শোষণ মুক্ত সমাজ আমাদের লক্ষ্য সমাজবাদ আমাদের মঞ্জিল ! আমরা খেটে খাওয়া শ্রমিক --

পুঁজিপতি নই, পরগাছা বুদ্ধিজীবীও নই । সোভিয়েত বিপ্লবের মৃত্যু নেই আমাদের অনুভবে । বলুন -- পুঁজিবাদ মুর্দাবাদ ! সমাজবাদ জিন্দাবাদ । সোভিয়েত বিপ্লব অমর রহে ।'' জিন্দাবাদ ধ্বনির গর্জন শেষ হওয়ার অনেক পর অব্দি বক্তৃতা চলল, শেষ করতালি পড়ল, কিন্তু আর কিছু শুনতে পাইনি ।

-- ভাসিয়ে দিলেন!

-- সত্যি একে বলে ওরেটর !

-- এটা শুধু বাগ্মীতার ব্যাপার নয় । চা খাবি ?

সন্ধ্যার আধো অন্ধকারে আমি, রাজীব, ইউকোর সমীর, পি. এন. বি.র অওয়ধ, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কিশোর একটা চায়ের ঠেলার সামনে দাঁড়ালাম।

-- চা হবে নাকি ?

-- কটা ?

-- পাঁচটা ... না সাতটা । ওই তো আফতাবসাহেবও আসছেন দিলীপকে সাথে নিয়ে ।

-- অত দুধ নেই । চারে সাতটা বানিয়ে দেব ?

-- সন্ধ্যে সাতটায় দুধ নেই ? তা আর কি করা যাবে । তাই দাও। উনুনে আঁচ আছে তো ? টাটকা বানিয়ে দিতে হবে কিন্তু, চালু চা চলবে না।

-- নেইই তো আর চালাবো কী ? বানিয়েই দিচ্ছি ।

আফতাবসাহেব আমাদের ঠাহর করে নিয়েছিলেন । এসে দাঁড়ালেন।

-- শুধু চা ! চা আর চা ! বাজারে যেন আর কিছু পাওয়া যায়না।

-- তাও আধ কাপ পাবেন ।

-- কেমন লাগল ? ঠিক ঠাক বললাম তো ?

-- বললেন মানে ? অসাধারণ । ভাসিয়ে দিলেন একেবারে !

-- ধুর্ ! তোদের প্রশংসার ধার ধারিনা । ক্রিমিন্যাল কি বলে ?

ব্যাঙ্কে গত বছর একটা জালিয়াতির মামলায় ফেঁসে যাওয়ার পর থেকে আফতাব সাহেব আমাকে মাঝে মধ্যে স্নেহ ভরে ক্রিমিন্যাল বলে ডাকেন। এখন আমার দিকেই তাকিয়ে আছেন ।

-- বল ভাই । তুই কি বলিস ।

-- বলব ?

দিলীপ পিছন থেকে ফোড়ন কাটল 'বলো বলো, আফতাব সাহেব এক তোমাকেই তো মানেন ।'

-- তিনটে জিনিষ শিখলাম আফতাব সাহেব । আপনার বক্তৃতা থেকে।

-- কী কী ?

-- এক যা আপনি নিজেই বলেন, জোশের সাথে হোশ থাকে পুরো মাত্রায় আপনার বক্তব্যে । আজ দেখলাম তা কত গভীর অব্দি আপনি বজায় রাখতে পারেন আর তা বজায় রাখতে ভাষার কতটা জোর নিজের আয়ত্তে রাখতে হয় ।

-- আর ?

-- আর দুই, যাকে ইংরেজীতে বলে ষাঁড়কে শিংয়ে ধরা -- যে ইস্যুটা সবাই এড়িয়ে যাবার কথা ভাবছে সেখান থেকেই পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক শুরু

পুঁজিপতি নই, পরগাছা বুদ্ধিজীবীও নই। সোভিয়েত বিপ্লবের মৃত্যু নেই আমাদের অনুভবে। বলুন -- পুঁজিবাদ মুর্দাবাদ! সমাজবাদ জিন্দাবাদ। সোভিয়েত বিপ্লব অমর রহে।'' জিন্দাবাদ ধ্বনির গর্জন শেষ হওয়ার অনেক পর অব্দি বক্তৃতা চলল, শেষ করতালি পড়ল, কিন্তু আর কিছু শুনতে পাইনি।

-- ভাসিয়ে দিলেন!

-- সত্যি একে বলে ওরেটর!

-- এটা শুধু বাগ্মীতার ব্যাপার নয়। চা খাবি?

সন্ধ্যার আধো অন্ধকারে আমি, রাজীব, ইউকোর সমীর, পি. এন. বি.র অওয়ধ, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কিশোর একটা চায়ের ঠেলার সামনে দাঁড়ালাম।

-- চা হবে নাকি?

-- কটা?

-- পাঁচটা ... না সাতটা। ওই তো আফতাবসাহেবও আসছেন দিলীপকে সাথে নিয়ে।

-- অত দুধ নেই। চারে সাতটা বানিয়ে দেব?

-- সন্ধ্যে সাতটায় দুধ নেই? তা আর কি করা যাবে। তাই দাও। উনুনে আঁচ আছে তো? টাটকা বানিয়ে দিতে হবে কিন্তু, চালু চা চলবে না।

-- নেইই তো আর চালাবো কী? বানিয়েই দিচ্ছি।

আফতাবসাহেব আমাদের ঠাহর করে নিয়েছিলেন। এসে দাঁড়ালেন।

-- শুধু চা! চা আর চা! বাজারে যেন আর কিছু পাওয়া যায়না।

-- তাও আধ কাপ পাবেন।

-- কেমন লাগল? ঠিক ঠাক বললাম তো?

-- বললেন মানে? অসাধারণ। ভাসিয়ে দিলেন একেবারে!

-- ধুর্! তোদের প্রশংসার ধার ধারিনা। ক্রিমিন্যাল কি বলে?

ব্যাঙ্কে গত বছর একটা জালিয়াতির মামলায় ফেঁসে যাওয়ার পর থেকে আফতাব সাহেব আমাকে মাঝে মধ্যে স্নেহ ভরে ক্রিমিন্যাল বলে ডাকেন। এখন আমার দিকেই তাকিয়ে আছেন।

-- বল ভাই। তুই কি বলিস।

-- বলব?

দিলীপ পিছন থেকে ফোড়ন কাটল 'বলো বলো, আফতাব সাহেব এক তোমাকেই তো মানেন।'

-- তিনটে জিনিষ শিখলাম আফতাব সাহেব। আপনার বক্তৃতা থেকে।

-- কী কী?

-- এক যা আপনি নিজেই বলেন, জোশের সাথে হোশ থাকে পুরো মাত্রায় আপনার বক্তব্যে। আজ দেখলাম তা কত গভীর অব্দি আপনি বজায় রাখতে পারেন আর তা বজায় রাখতে ভাষার কতটা জোর নিজের আয়ত্তে রাখতে হয়।

-- আর?

-- আর দুই, যাকে ইংরেজীতে বলে ষাঁড়কে শিংয়ে ধরা -- যে ইস্যুটা সবাই এড়িয়ে যাবার কথা ভাবছে সেখান থেকেই পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক শুরু

করার সাহস।

দোকানী চা দিয়ে গিয়েছিল । চায়ে চুমুক দিয়ে বললাম "তিন, নিজের জনতার ওপর সুপ্রীম কনফিডেন্স, পরম বিশ্বাস যে আমি যা ভাবাবো ওরা তাই ভাববে কেননা আমি ওদের ভালোবাসি আর ওরাও আমাকে ভালোবাসে। ..... এ না হলে জোয়ার তোলা যায় না । আর জোয়ারটা আজ আপনিই তুলেছেন । প্রধান বক্তা নয়।"

— এটা ওই সেদিনকার তেলেভাজার ফল । বুঝেছ ? এবার একটা সিগারেট খাওয়াও তো !

একটু পরে শুধু আমি আর রাজীব স্টেশনের কাছে আলাদা হচ্ছিলাম।

— কি ভাবছিস কি ?

— ভাবছি আরো একটা কথা যা বলা হলনা ।

— কি কথা ?

— আফতাব সাহেবকে এতদিন ধরে তো শুনছি ! ইতিহাস, মিথ নিয়ে বিস্তৃত তাঁর রূপক নির্মাণ প্রক্রিয়া, তারই সাথে সংগ্রামের দৈনন্দিনটাকেও মিলিয়ে দেওয়া -- ভিতরের গণিতটা বুঝতে চেষ্টা করি । অথচ উনি কিন্তু ভেবে বলেন না । স্বতঃস্ফূর্তভাবে রিয়্যাক্ট করেন । সেটাই এত সুগঠিত, সংবদ্ধ আর তীব্র হয়ে ওঠে । শুধু উনি বলে নন। এ ধরণের বড় বক্তা যাঁরা আছেন তাঁদের গুপ্ত রহস্যটা কি? ওই যে তিনটে ব্যাপার তখন চায়ের দোকানে বললাম ওগুলো তো গুণ! প্রপার্টিজ ! -- ডায়নামিক্সটা কি ?

— আঁতলামো আরম্ভ করলি ?

-- না না, আঁতলামো না । আসলে ওনার ওই কথাটা ভুল ভাবে বলা।

-- কোন কথাটা ?

— ওই জোশের ভিতর হোশ । ওটা জোশের ভিতরে হোশ নয়, হোশের জোশ । উদ্দীপনার ভিতরে চেতনা নয় চেতনার উদ্দীপনা । জুবিল্যান্স অফ কনশাসনেস । জয় অফ কনশাসনেস । ফোর্স অফ কনশাসনেস্ । সেটাই এগিয়ে হয় উইজডম, আর গড়ে ওঠে সত্যিকারের কথাশিল্প -- বাগ্মীতা।

— আচ্ছা হয়েছে । বাড়ী গিয়ে ডাইরিতে লিখিস । আমি চল্লাম।

নেতাগিরি

রোববার বেলা দুটো । লড়ে হাতানো ইউনিয়ন অফিসে গেঞ্জী আর প্যান্ট পরে বসে আছি আমরা চারজন -- আমি অমর, মণিভূষণ আর আসিফ। রাজীব সাধারণ সম্পাদক, গেছে ভূঁজা আনতে। এই নিয়মটা ওরই করা যে আসিফ কিম্বা যোগী সাব-স্টাফ বলে ওদের দিয়েই ফাই ফরমাশ খাটানো হবে না । যে কেউ যেতে পারে । তাই আসিফকে ধমক দিয়ে বসিয়ে নিজে গেছে।

নতুন মোল্লা তাই পেঁয়াজের খাওন বেশী । আর এই সব গুণগুলোর বলেই মণিভূষণকে ধরে রাখতে পেরেছে। কদ্দিন থাকবে সে আলাদা কথা তবে কাজে কর্মে আসছে মণিভূষণ -- সম্মেলনে সাধারণ সম্পাদক পদ থেকে অপসারিত হওয়ার পরেও; হয়ত একটু অপমান, একটু ক্ষোভ, একটু ধরা পড়া ভাবের কালিমা আর দূরত্ব চোখে থাকছে সারাক্ষণ -- বিশেষ কোনো কোনো কথায় বোঝা যায় ।

রোববারের এই প্রোগ্রামটা বড়বাবুর ধ্যাঁতানি খেয়ে করতে হয়েছে। গত রোববার কার্যকারী সমিতির বৈঠকে অফিসের হালচাল শুনে বড়বাবু ফেটে পড়েছিলেন, "বন্ধ করে দাও ইউনিয়ন অফিস ! তালা ঝুলিয়ে রেজিস্ট্রেশন সারেন্ডার করে দিয়ে এস ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রারের কাছে। চিঠি আছে ফাইল নেই, ফাইল আছে চিঠি নেই, এওয়ার্ডের একটা ঘষা ফটো কপি আছে যা পড়া যায়না, অরিজিন্যাল কার কাছে হদিশ নেই, ডেসপ্যাচ রেজিস্টার আছে কিন্তু এন্ট্রি নেই, কি কি করনীয় কাজ সব পেট থেকে বেরুচ্ছে পা ঝাঁকিয়ে আর কান চুলকে, ওয়ার্ক ডায়েরী বলে একটা বস্তু থাকতে পারে টেবিলের ওপর তা কারো বোধগম্যও হচ্ছেনা।

সাসপেন্সের এন্ট্রি এডজাস্ট করে দেওয়া হচ্ছে খরচের খাতে কেননা খরচ যিনি করেছেন তিনি অতিব্যস্ত নেতা, বিল দেওয়ার ফুরসৎ নেই, অথচ বছরের শেষে একাউন্টস ক্লোজ করতে হবে । ... আমি তো মনমৌজি লোক, নিজেও কিছু নিয়ম মেনে কাজ করিনি সারাজীবন ... কিন্তু আমিও বুঝতে পারছি বরুণবাবু কি বলতে চাইছেন। উনি পোড় খাওয়া নেতা, অনুশাসন কি জিনিষ তা জানেন বলেই বারবার সাবধান করছেন তোমাদের। একদম ঠিক বলেছেন যে এভাবে ইউনিয়ন চলার অর্থ দুর্নীতি আর ব্যক্তিবাদের জন্য জায়গা তৈরি করে দেওয়া । আমি জানি রাজীব দুর্নীতিগ্রস্ত নয়, ব্যক্তিবাদীও তোমরা কেউ নও। কিন্তু যদি কাজকর্ম ঠিক মত না করো তাহলে তোমাদের মধ্যে থেকেই কেউ হয়ে উঠবে দুর্নীতি-পরায়ণ, কেউ হবে ব্যক্তিপন্থী । ইউনিয়নের ভাবমুর্ত্তি বিপন্ন হবে । অন্যদের থেকে তোমাদের তফাৎটা -- যার জন্য কর্মচারীরা তোমাদের ইজ্জৎ দেয়, কর্ত্তৃপক্ষও সমীহ করে -- বাঁচিয়ে রাখতে পারবে ?..."

অগত্যা এই রোববারের ক্র্যাশ প্রোগ্রাম -- ইউনিয়ন অফিস গোছাই অভিযান।

ইউনিয়নের আর কোঅপারেটিভের একটাই অফিস ঘর । তবে আমাদের আজকের দায়িত্ব শুধু ইউনিয়নের আলমারী আর টেবিলের দেরাজ সাফ করে আবর্জনামুক্ত করা, অপ্রয়োজনীয় কাগজ পত্র সেরদরে বেচে দেওয়ার জন্য বেঁধে ছেঁদে রাখা, জরুরী চিঠি পত্র সার্কুলার দলিল ইত্যাদি ছাঁটাই করে ফাইলিং করা, ফাইল, এওয়ার্ড, সেটলমেন্টের বই ইত্যাদি সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা, ডেসপ্যাচ রেজিস্টার যাতে ব্যাবহার করা যায় তার জন্য টেবিলের ওপর রাখা, মেম্বারশিপ রেজিস্টার আপডেট করা আর সবশেষে

ওয়ার্ক ডাইরি তৈরি করা।

কাজ প্রায় শেষ। শুধু শেষ কাজ দুটো বাকি। রাজীব ভুঁজা নিয়ে এল। হাত মুখ ধুয়ে খবরের কাগজে স্তূপাকার করে ভুঁজা ঢেলে খাওয়া শুরু হল। সঙ্গে পেঁয়াজ, কাঁচা লঙ্কা, নুন। প্রথম গ্রাস মুখে দিয়ে চিবোচ্ছি তখনই দেখলাম কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে রাম নন্দন শুক্লা আসছে।

— কি খবর ? কোত্থেকে ?

— ভাগলপুর থেকে। দুপুরে পৌঁছে চৌধুরীজীর (মানে রাজীব চৌধুরির) বাড়িতে ফোন করে জানলাম ইউনিয়ন অফিসে গেছেন সকালে — এখনো ফেরেননি। তাই চলে এলাম !

— সব ঠিক ঠাক তো ?

— ঠিক ঠাক ? কালকে আপনাদের ভাগলপুরে থাকতে হবে। আজ রাতে ফরাক্কা ধরে আমার সাথে চলুন।

— মানে ? সারাদিন এখানে লেগে আছি। বাড়ি ফিরব সন্ধ্যাবেলা রিজার্ভেশন নেই, মানে রাতেও ঘুম হবেনা।

— ওসব জানিনা। কাল ওখানে থাকতে হবেই। নইলে সব গড়বড় হয়ে যাবে।

— কি হয়েছে কি ?

— জব্বর খেলা। ঘোটালা।

— কিসের ঘোটালা ? কী ? মানে ফ্রড ?

— জবরদস্ত ফ্রড। সাড়ে বারো লক্ষ টাকার।

— কী হয়েছে খুলে বলবে তো !

মণিভূষণ এতক্ষণ চুপচাপ শুনছিল। হঠাৎ জিজ্ঞেস করল

"বলবেখন। আগে বল তোমার দুপুরের খাওয়া হয়েছে কিনা।" প্রশ্নটা শুনেই আমি ইষৎ লজ্জিত হলাম। আড়চোখে রাজীবের দিকে চেয়ে দেখলাম ও আমার দিকে তাকিয়ে। সত্যিই তো, নেতা হিসেবে এ প্রশ্নটা আগে ওরই করার কথা। এসব ছোটাখাটো কিন্তু জরুরী আন্তরিকতা কেউ শিখিয়ে দেয় না।

— না, থাক না। স্টেশনে নেমে আমি একটু নাস্তা করে নিয়েছি।

— 'থাকনা' আবার কি ? রাজীব ওর জন্য কিছু খাবারের ব্যবস্থা করো।

— এক্ষুণি করছি।

আমার পকেটে টাকা ছিল। রাজীবকে কথা বলতে বলে কিছু খাবার আনতে দেওয়ার জন্য আসিফকে সঙ্গে নিয়ে বাইরে বেরুলাম। তিনটের সময় ভাত পাওয়া গেলেও খেতে ইচ্ছে করবেনা। আসিফকে হোটেল থেকে একটা মসাল দোসা নিয়ে আসতে বললাম।

রাজীব, অমর আর মণিভূষণ ভিতরে বসে শুক্লার সাথে কথা বলছে। আমি বাঁদিকে গাছতলায় ভাঙা দুটো অটো আর কুবোটা হ্যান্ডটিলারের পাশ দিয়ে ঝাড় জঙ্গলে ঢুকলাম পেচ্ছাপ করতে। একটু সতর্ক ভাবে। কেননা তিনচারটে নেউল ঘোরা ফেরা করে এখানে। মানে সাপও আছে হয়ত। মার্চের শেষ। মাথার ওপর অমলতাসের ডালপালাগুলিতে একটাও পাতা নেই বলতে গেলে। সাতটে ছাতারে নাচানাচি করতে করতে কিচির মিচির করছে। ফিরে এসে শুনলাম প্রোগ্রাম তৈরি হয়ে গেছে।

ভাগলপুর স্টেশনের সামনেই হোটেল। কিন্তু ট্রেনটা অসময়ে

পৌঁছোয়। রাত তিনটেয় হোটেলের দরজা খোলানো যায়না হাজার কাকুতি মিনতি করেও। কাজেই আঁধার ফিকে হওয়া অব্দি প্ল্যাটফর্মের বেঞ্চিতে ঝিমিয়ে তার পর হোটেলে ঢুকে চার ঘন্টার টানা আরাম ।

ব্রাঞ্চে তখনও উপস্থিতি শীর্ণ । ম্যানেজার, হেডক্যাশিয়ার, গার্ড, বিলকালেক্টর আর বুড়ো দপ্তরি । চারজন স্টাফের একজনও আমাদের সদস্য নয়। আবহাওয়াও একটু ইচ্ছাকৃত ভাবে 'হোস্টাইল' যাকে বলে শত্রুভাবাপন্ন — তাই মনে হল। ম্যানেজারের অতীতটা জানি; সেও প্রতিদ্বন্দ্বী ইউনিয়নের একেবারে কোরগ্রুপের খাস লোক । তবে এটা প্রধান কারণ নয় । খাসলোকেদের দরাজ কুটনীতি অনেক দেখেছি । বসিয়ে রসমালাই খাওয়ায়। আজকের আবহাওয়াটা তৈরি করা — আমাদের উপেক্ষা করে দমিয়ে দিতে আর যে চারজন আমাদের সদস্য (তিনজন কেরানী আর একজন অধস্তন কর্মচারী—ওই লক্ষ্মী নারায়ণ শুক্লা, যদিও তারা এখনও আসেনি, 'ওদেরকে বুঝিয়ে দিতে' । শুক্লা আমাদের হোটেলে ঢুকিয়ে বাড়ী চলে গিয়েছিল।

বসে আছি; আমি, মণিভূষণ আর রাজীব । একটু পরে এক এক করে আমাদের তিন সদস্য ঢুকল । আমাদের নমস্কার টমস্কার করে কথা বলতে বলতেই কাজে বসে গেল । তিনজনের মধ্যে দুজন ব্যাঙ্কের চাকরীতে পাঁচ বছরের রেঞ্জে, একজন অধস্তন কর্মচারী থেকে প্রমোটি । এই প্রমোটি আর বাকি দুই জনের একজন সাড়ে বারো লক্ষ টাকার কারচুপির মামলায় জড়িয়ে গেছে । জড়িয়ে তো ম্যানেজার আর ওই সংগঠনের বড়বাবুও রয়েছে — কিন্তু এরা ভয় পেয়ে আছে। ম্যানেজার হম্পি-দম্পি করে কেস ঘোরাবার তালে আছে নিশ্চিত । সবশেষে ঢুকল লক্ষ্মী নারায়ণ শুক্লা।

বিলকালেক্টর। পুরোনো ও স্থানীয় লোক, ওকে দমাতে পারেনা কেউ । ওকে নিয়েই ম্যানেজারের চেম্বারে ঢুকলাম । নমস্কার করলাম । হঠাৎ আমাদের সবাইকার নমস্কার দাবিয়ে দিয়ে মণিভূষণ বাজখাঁই গলায় এমন একটা নমস্কার ছাড়ল যে চমকে গেলাম । ব্যাপার কি ? এতক্ষণ তো বেশ চুপচাপ ছিল মণিভূষণ! অবশ্য ও পুরোনো নেতা, ম্যানেজার গিরিশ প্রসাদের সাথে ওর পুরোনো পরিচয় থাকতেই পারে।

— নমস্কার, নমস্কার । তারপর বলুন ব্যাঙ্কের কি হালচাল ? আমাদের চাকরীটা সুরক্ষিত আছে তো ?

(খোঁচাটার জবাব দিতে মণিভূষণই এগিয়ে এল একটা চেয়ার টেনে বসে। রাজীব কিছু বলতে যাচ্ছিল শোনাই গেলনা।)

— এমন কথা বলেন গিরিশবাবু ! ই. ডি. র সাথে যার খাতির সে চাকরীর সুরক্ষার কথা বলে ?

— ই. ডি. ! মানে একজিকিউটিভ ডিরেক্টর !

— হ্যাঁ ! ভার্গীজ সাহেব । কথা হচ্ছিল গত শুক্রবার ওনার চেম্বারে বসে। বললেন বিহারে এত ফ্রড কেস বাড়ছে এটা একটা সিরিয়াস ইস্যু ! তাতেই আপনার নাম করে বললেন দেখ ভাগলপুরের ম্যানেজার প্রসাদ কত এফিসিয়েন্টলি ডীল করছে ফ্রডের ব্যাপারটা ! এসব ব্যাপারে স্ট্রিক্ট না হলে চলেনা । আর তোমাদের রিজিওন্যাল ম্যানেজার সেখানে এত দুর্বল! যে সাপোর্ট প্রসাদের পাওয়ার কথা পাচ্ছেনা । ... আমি বললাম আমরা পুরোপুরি আপনার সঙ্গে আছি স্যার। তা সে আমারই মেম্বার ইনভল্‌ভ হোক না কেন । তার পর সি.ভি.ও.র সাথেও দেখা হল একজিকিউটিভ ক্যান্টিনে । ভার্গিজ সাহেবই নিয়ে গেলেন — না, দুপুরের

লাঞ্চটা সেরে যাও । সি.ভি.ও. কেও, মানে দুদিন আগেই তো তিনি জয়েন করেছিলেন, এম. আর ঘোষ, বললেন বিহারের কেসগুলি স্ট্রং হ্যান্ডেড্‌লি ডীল করতে । ... তবে স্যার দুঃখ এটাই যে আপনার কাছ থেকে যে ফেয়ারনেস আশা করতে পারতাম আপনার চলে যাওয়ার পর সে আশা আর থাকবেনা ।

— 'চলে যাওয়ার' মানে ?

— মানে ? সে তো আপনি জানেনই যে ট্রান্সফারের লিষ্ট এপ্রুভালের জন্য গেছে । চলেই আসবে ! আবার এও জিজ্ঞেস করবেন না কোথায় । সেটাও আপনি জানেন । বাড়ী ফিরছেন । এখানে রাঘবেন্দ্র সিং আসছেন ।

— কই আমি তো এসব কিছু শুনিনি !

— কেন মিথ্যে বলছেন স্যার ! যা হোক আমরা চলি । আমাদের কমরেডদের নিয়ে একটু কথা বার্ত্তা বলে, চেষ্টা করব মুংগের হয়ে যেতে। ওহ্‌, সরি রাজীব, ম্যানেজারসাহেব ! ইনি আমাদের বর্ত্তমান জেনারেল সেক্রেটারী ! আপনাকে কিছু বলতে চাইবেন ।

রাজীব সপ্রতিভ ভাবেই খেই ধরে নিল ।

— ম্যানেজার সাহেব । আমাদের সীনিয়র লীডার বলেই দিয়েছেন মোদ্দা কথাটা । আমরা আশা করি আপনি সঠিক পথেই ফ্রডের ব্যাপারটা ডীল করবেন । অযথা হয়রান যেন না করা হয় কর্মচারীদের । সত্যি বলতে কি এফ. আই. আর. এর কপি হাতে পাওয়ার পর আমি ভাবছিলাম কেসটা সি. বি. আই. এর হাতে দেওয়ার দাবী তুলব এ. জি. এম. এর কাছে । আমাদের মণিদাই আশ্বস্ত করলেন যে পুলিসের তদন্ত সঠিক পথেই

এগোচ্ছে, গিরিশবাবুও নিরপেক্ষ লোক, আগে কবে কোন ইউনিয়নের সক্রিয় সমর্থক ছিলেন সেটা অবান্তর । তাই আপনার ওপর ভরসা করেই যাচ্ছি ।

— আরে না, বসুন ! বসুন ! মাঝে মধ্যে আপনারা এলে সব খবরাখবর পাই । চা আসছে ।... আর আপনারা এসেছেন ! একটু মিষ্টিমুখ না করে চলে যাবেন তা হয় নাকি ?

তারপর আরো অনেকক্ষণ দেশদুনিয়ার সুপুরি চিবোনো চলল ।

ব্রাঞ্চ ছাড়ার সময় দেখলাম ভেলকি — ম্যানেজার চেম্বার ছেড়ে গেটের কাছে এসে করমর্দ্দন করল, নিচে রাস্তা অব্দি এল পান খাওয়াতে। অন্য ইউনিয়নের বড়বাবু আমাদের দুর থেকে নমস্কার করে চুপচাপ ঢুকল ম্যানেজারের চেম্বারে — দেখলাম ফোন ঘোরাচ্ছে ।

বিকেলে ট্রেন ধরার আগে আর একটা রুটিন কাজ করলাম । অন্যান্য ব্যাঙ্ক থেকে জেলা সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ও আরো দু' একজন নেতাকে অনুরোধ করে সঙ্গে নিয়ে গেলাম থানায় । ও. সি.র সাথে দেখা করে নিয়মমাফিক একটা মৌখিক আবেদন করে এলাম যে তদন্ত আইনের পথে চলুক, অযথা হয়রানি যেন না করা হয় কর্মচারীদের।

পেটের মধ্যে প্রশ্নটা ফুলছিল । ট্রেন ছাড়তেই ধরলাম মণিভূষণকে "এটা কি হল ? গত শুক্রবার কেন, গত এক মাসেও আপনি হেড অফিসে যাননি ?"

ট্রেনে ভীড় । গেটের কাছে দাঁড়িয়ে ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করছিলাম । মণিভূষণ ইষৎ ম্লান হেসে বলল "তাহলে কি দিল্লীতে ব্যাঙ্ক-মন্ত্রীর কাছে যাওয়ার কথা বলতাম ?"

— মানে ?

— তুমি নেতাগিরি দেখনি । এদেশে নানান শিল্পে বা অন্য যে কোনো সেক্টরে এই নেতাগিরিই চলে । লোকে এটাই খায় । এটাতেই ভরসা করে, ভয় পায় । ...পাঁচ আঙ্গুলে পাঁচটা আংটি পরো । খাদির বা সিল্কের কুর্তা, পায়জামা.... আদবকায়দার তোয়াক্কা না করে হোমরা চোমরা চোর আমলাদের ঘরে ঢোকো, এলাহি ভাবে নমস্কার সেরে বলো এক্ষুনি মন্ত্রীজীর সাথে দেখা করে আসছ, মন্ত্রীজী ফোনে চেষ্টা করছিলেন আপনার লাইনটা পাচ্ছেন না, ওকেই বল মন্ত্রীকে ফোন লাগাতে — ও জীবনে লাগাবার সাহস পাবেনা — চীফ সেক্রেটারী, ফাইনান্স সেক্রেটারী, পি. এ. ইত্যাদিদের নাম, ফোন নম্বর জাত-বেরাদরি আউড়ে যাও, দেখবে আশি পার্সেন্ট কাজ হাসিল হয়ে গেছে । কোনো নীতিগত চুক্তি তো করছোনা ? কাজও যেমন ছোটখাট তদ্বির তদারক, লোকগুলোও তেমন গোলাম তন্ত্রের দুর্নীতি পরায়ণ আমলা, ওইসব ছোটোখাটো কাজে প্যাঁচ পয়জার কষতে দারুণ যৌন সুড়সুড়ি পায় । ও দিয়েই বোঝায় ওদের কত তাকত — পাওয়ার । ওদের পাওয়ার ওদেরই পাওয়ার দিয়ে কাটো! আর সেই হিসেবে ম্যানেজারের যা পাওয়ার তার লাগসই পাওয়ারটুকুই দিলাম। দেখলাম রাজীব পারবেনা । ও তো লেখা স্ক্রিপ্টের পার্ট মুখস্থ করে তবে এক্টিং করবে। আর তোমার তো কথাই নেই — হয়ত ওখানেই নীতির প্রশ্ন উঠিয়ে দেবে । তবে এটাও কিন্তু ঠিক রাজীব, যে তোমাকে করতে হবে এগুলো ।

— কি করতে হবে ?

— হেড অফিসে গিয়ে হোমরা চোমরাদের সাথে দেখা করে সেলাম

নমস্তে ফালতু বকবক করে নিজের রাজ্যের হাল হকিকৎ গোপন খবর এলোপাথাড়ি ছড়িয়ে ব্যাক্তিগত পরিচিতি গড়ে তুলতে হবে । র‍্যাপো ! র‍্যাপো ! এসব জায়গায় ওগুলো খুব কাজে লাগে । ... আরে ওরাও তো ওই মাল। এক তো সামন্ততান্ত্রিক জমি থেকে আসছে । দ্বিতীয়তঃ উদ্দেশ্যহীন জাবর কাটতে কাটতে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। ওদের কাছে গিয়ে দশবার 'নমস্কার স্যার কেমন আছেন' বললে ওদেরও ভালো লাগে । তোমাকে মনে রাখে।

— তাহলে কাল হোলি দেওয়ালিতে মিষ্টি, বৌদির কাছে গিয়ে বাড়ির তরি তরকারী, হোটেলে মদের বোতল...

— করেই তো ! যারা পারে তারা করে । ওরা চায়ও সেটা । তুমি তো আর পারবে না ! তবে যেটুকু পারবে সেটুকু ছাড়বে কেন ? নিজের জন্য তো আর করছোনা ? ইউনিয়নের স্বার্থে করছো ।

— হাওয়া কিন্তু সত্যি বদলে দিয়েছিলেন !

— ওর বেশী করার স্কোপও ছিল না । তদন্ত নিজের পথে এগোবে। শুধু যারা ভয়ের গোঁসাই তাদের ভয় দেখানো আর যারা ভরসা চায় তাদের ভরসা দেওয়া যে আমরাও পাওয়ার রাখি অনেক ভেতর অব্দি যাওয়ার । রাজীবও ভালো দিয়ে দিল সি. বি. আই. এর ইশারাটা । এফ. আই. আর. টা যে একপেশে সেটা বুঝিয়ে দিল । তবে রাজীব ! আই. ও. কে যে আলাদা করে ডেকে নিয়ে গেল শুক্লা আর ওই ডিস্ট্রিক্টের জি. এস. সোহন কুমার... আই. ও. র এটিটিউডটা জেনে নিও । ... এটা তো বুঝতে হবে যে ওখানে সত্যি সত্যি আমরা দুর্বল। পুরো ইউনিট আমাদের হলে ওই রকম এফ. আই. আর. হত ?

দেখি রাজীব ফিক ফিক করে হাসছে।

— কি হল ?

— এত দিনে বুঝলাম বড়বাবুর কথাটার মানে।

— কি কথা ?

— মাল টেনে একদিন রাতে বলছিলেন না — খিস্তি করে ?

— কি ?

— পেচ্ছাপ যা পেটে আছে তার বেশী তো আর করতে পারবেনা! আর করতে চেষ্টা করলে জ্বালা করবে। তাই বেদ বাক্য হল 'মোতো কম, নাচাও বেশী'। সব শালা ঠান্ডা থাকবে ওতেই।

আড়াই পেগ

বড়বাবুর কিছু দুর্বলতা আছে। না, মদ নয়। অবশ্য আগে তাই মনে করতাম। কিন্তু এখন মনে হয় রাতের ওই আড়াই পেগ, ওনার প্রাত্যহিক সেতুভস্ম। ইংরেজীতে কথা আছেনা ? সেতু পুড়িয়ে ফেলা ! ন্যাট কিং কোলের গানের সেই রোমাঞ্চক লাইন 'আমার কাঁধের পিছনে তুমি কি দেখছনা, সব সেতু পুড়ে ছাই হয়ে গেছে'.....।

সেতু-পোড়া ছাই জলে গুলে সবান্ধবে পান। যাতে নদী বা ওপার ঘোলাটে না হয়। ঘোলাটে হলে ভেতরটা হোক। যাতে দেখানো যায় স্পষ্ট — ওই দেখ, নদী। ওই দেখ ওপার। সেতু না থাকলে ওপারের আকর্ষণটা আত্মিক ও মজলিশি থাকে। সেতু থাকলে হয়ে যায় শারীরিক। তখন একের পর এক আসে চাল ডালের হিসেব, ঘর সংসার, থিতু হয়ে বসা।

বড়বাবুর দুর্বলতা অন্য জায়গায়।

অফিসার স্কেল-২ থেকে তিনে প্রমোশনের ইন্টারভিউ। হঠাৎ রাজীব ডেকে আস্তে করে বলল "তোকে কোলকাতা যেতে হবে, আজই।"

— কি করতে ?

— উল্টো তদ্বির করতে।

— তুই এসব আরম্ভ করলি কবে থেকে ? কোন অফিসারের প্রমোশন হবে না হবে তাতে আমাদের কি ? ম্যানেজমেন্ট হিসেবে যেই থাকুক আমাদের লড়াই করেই বাঁচতে হবে। এসব যারা করার তারা করে। প্রমোশনের জন্য তদ্বির করতে মালও কামায় ভালো মত। তুই তো কামাস না !

— ওসব ছাড় । ব্যাপারটা জরুরী ।

— খুলে বলবি তো কি ব্যাপার ।

— ব্যাপার এই যে বড়বাবুর একটা উল্টো ক্যান্ডিডেট আছে ।

— মানে ?

— যেমন উল্টো তদ্বির তেমনই উল্টো ক্যান্ডিডেট ! মানে বড়বাবু চাননা যে তার প্রমোশন হোক ।

— বড়বাবু ফোন করেছিলেন ?

— না । করবেনও না। ভালো করে শোন্ । জিয়ালাল প্রসাদ এখন পীরপৈঁতি ব্রাঞ্চের ম্যানেজার । ও যাচ্ছে ইন্টারভিউ দিতে । তিনজনের বোর্ডে এবারে বিকাশ চন্দও আছে । তোর সঙ্গে তো ভালো খাতির রয়েছে তার ?

-- সে তো বহুকাল আগে, একসাথে রামি খেলতাম নায়ারের বাড়িতে।

-- আঃ খাতিরটা তো এখনও আছে । হেড অফিসে গিয়ে দেখা করলেই তো তোকে বসিয়ে মিষ্টি খাওয়ায়, বাড়ি নিয়ে যায় ।

-- সে যায় । তবে জি. এম. হওয়ার পর দেখা করিনি । এখন বড় একজিকিউটিভ । তাছাড়া চন্দদা এসব তদ্বির পছন্দ করবে কিনা .....

-- তাই তো তোকে পাঠানো । ও জানে যে তুইও এসব ধান্দায় নেই। নীতিবান, সৎ, একনিষ্ঠ এবং একগুঁয়ে ইউনিয়ন কর্মী ।

-- থাক, থাক। কিন্তু উল্টো তদ্বির কেন ? কি দোষ করেছে বেচারা?

-- সে সব অনেক কথা । সংক্ষেপে এটুকু জেনে নে যে এতে বড়বাবুর সেন্টিমেন্ট ইনভল্‌ভ । ওনার প্রেস্টিজ ইস্যু।

— যাঃ শালা।

বাঃ, পুরোদস্তুর কেরানী হয়ে গেছি দেখছি । ভিতরে ভিতরে ব্যাপারটা থ্রিল দিতে শুরু করেছে ! আমার তদ্বিরে কারো প্রমোশন আটকে যাবে! এ সেই সত্যজিৎ রায়ের 'সীমাবদ্ধ' র প্রসঙ্গ । হারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় করেছিলেন। বোর্ড অফ ডিরেক্টরের এক ডিরেক্টর — আর্মি অফিসের প্রাক্তন কর্মচারী। কোনো জেনারেল — বোধহয় সেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার 'মরুশৃগাল' রোমেল—এর ছুটির এপ্লিকেশন এক মাস আটকে দিতে পারার আনন্দে এখনো শিহরিত । বাকি ডিরেক্টরদের গল্পটা গর্ব করে শুনিয়ে খিক খিক করে হাসছেন ।...

কোলকাতায় গিয়ে কী কী হল তাতে বিশদ করে বলার কিছু নেই। বছরে আট দশ বার যাওয়া । আগে মামার বাড়িতে উঠতাম । ওখানে গিয়ে স্নান খাওয়া করে অফিস পাড়ায় আসতে বাসের ভীড়ে হাঁসফাঁস করতে হত । তাই আজকাল সোজা হেড অফিসের পুরোনো বাড়িটায় চলে যাই । পাঁচ তলায় স্পোর্টিং ক্লাবের রেস্ট হাউস । ব্যাগ রেখে তৈরি হয়ে বরং এক ঘন্টা জিরিয়েও নেওয়া যায় ।

হেড অফিসের নতুন বাড়িটায় আগে কখনও একা ঢুকিনি । শক্তিদা বা আর কোনো নেতাকে সঙ্গে নিয়ে গেছি । কাজেই গেটে কেউ আটকায়নি। আজ আটকাল । বললাম জি. এম. বিকাশচন্দ সাহেবের সাথে দেখা করব । নাম বললাম। ইন্টারকমে বোধ হয় সেক্রেটারী বলল, ব্যস্ত আছেন । এবার আঁতে ঘা পড়ল । সেটা মোবাইল বা সেলফোনের জমানা নয়। সিকিউরিটিকে বললাম 'আমায় কথা বলতে দিন'। আমার কোঁচকানো ভূরু আর গলার জোরে ইষৎ কাজ হল। রিসিভারটা বাড়িয়ে দিল। একটু

গলা উঁচু করে ফোনে জিজ্ঞস করলাম 'আপনি বিকাশ বাবুর সেক্রেটারী বলছেন' ?

— হ্যাঁ ! বললাম তো সাহেব ব্যস্ত আছেন ।

— শুনুন ! আপনি আপনার সাহেবকে বলুন যে পাটনা থেকে সুমন — নামটা মনে থাকবে তো ! -- সুমন, বলুন যে সুমন এসেছে । নিচে দাঁড়িয়ে আছে। যদি উনি তারপরেও বলেন যে ব্যস্ত আছেন তাহলে জানিয়ে দেবেন যে আমি ১৬ নম্বরে ইউনিয়ন অফিসে ওনার ব্যস্ততা শেষ হওয়ার অপেক্ষায় আছি । সারাদিন থাকব । রাত্রে ফিরে যাব ।

খটাস করে ফোনটা রেখে দিলাম । দু' মিনিটের মধ্যে কাজ হল । সিকিউরিটি ইন্টারকমে কান পেতে আমায় ইশারা করল উপরে চলে যেতে।

কার্পেট মোড়া চেম্বারের দরজাটা আস্তে করে খুলে ভিতরে উঁকি দিতেই বিকাশ চন্দ সামনের কাগজটা থেকে চোখ তুললেন ।

— আরে এস এস সুমন । একটু বোসো । (সামনে বসে থাকা অধস্তন অফিসারটির হাতে এক একটা কাগজ সাইন করে দিতে দিতে) হাতের কাজটা সেরে নিই । (পরের কাগজটায় সাইন করতে গিয়েও আবার দ্বিতীয়বার পড়তে পড়তে) এ চিঠিতে কোনো কাজ হবে মনসিজবাবু ?... অবশ্য শাস্ত্রে বলাই আছে, নিজের কাজ করে যাও ফলের প্রত্যাশা কোরোনা! আমার কাজ সাইন করা । আপনার কাজ চিঠি তৈরি করা আর পাঠানো — তা দিলুম সাইন করে (সাইন করে দিলেন) ।

লক্ষ্য করলাম হাতের কলমটা দামী এবং তার জোড়া বল্‌পেনটা পকেটে গোঁজা আছে । বাইশ বছর আগে ধানবাদের সেই বিকাশদা (শেষ দেখা, তখন খড়গপুরে এ.জি.এম., এই হেড অফিসেই ষোলো নম্বরে পনের

মিনিটের জন্য -- তাও সাত বছর হয়ে গেল) নায়ারের বাড়িতে রামি খেলতে খেলতে হঠাৎ বলে উঠতেন 'তুমি কেমন বাঙালী সুমন ? একটা রবীন্দ্র সংগীত জানো না ?'

— রবীন্দ্র সঙ্গীত !

— অফকোর্স ! বাঙালী ছেলে, এত সুন্দর গানের গলা আর শুধু হিন্দী গান গাও ! রবীন্দ্র সঙ্গীত, বাংলা আধুনিক কিছু তো জানবে ?

— বয়ে গেছে জানতে । শুনলেই ঘুম পায় ।

— তার মানে তুমি ভালো করে শোনোনি ।

— তা অবশ্য ঠিক । ওই জক্কনপুরের পুজো প্যান্ডেলে শুনেছি বাংলা আধুনিক আর ক্যালকাটা রেডিওতে রবীন্দ্র সংগীত । ছোটো বেলায় শোনা পঙ্কজ মল্লিকের 'খর বায়ু বয় বেগে', সকাল সাড়ে নটার প্রোগ্রামে — ব্যস ওই একটিই গান ভালো লাগে তবে তার কথাও জানিনা, অন্তরার সুরটাও মনে নেই ।

— তাই তো বললাম, তুমি শোনোনি । নায়ার ! কাল রামি চলবে আমার ঘরে । এই কুলাঙ্গারটিকে রবীন্দ্র সঙ্গীত শোনাতে হবে । পরের সন্ধ্যায় বিকাশদার বাড়িতে পৌঁছতেই বিকাশদা উঠে গিয়ে জেরার্ডের রেকর্ড চেঞ্জারটা চালালেন। সেই প্রথম শুনলাম দেবব্রত বিশ্বাসের 'আমি চঞ্চল হে'। কিছু দিন পরে শুনলাম সলিল চৌধুরীর সুরে হেমন্তর গাওয়া 'ঠিকানা' 'রানার'। শুনলাম উৎপল দত্তের আবৃত্তিতে নাজিম হিকমতের কবিতা ।......

— চলো ক্যান্টিনে । চা খেতে খেতে কথা হবে ।

হঠাৎ ঘোর ভাঙ্গল । সামনের ভদ্রলোক চলে গেছেন । বিকাশদা

উঠে দাঁড়িয়েছেন।

একজিকিউটিভ ক্যান্টিনের হেভি র‍্যালা। বিকাশদার মত লোকের সাথে না যাওয়ার হলে কোনো না কোনো বাহানা করে এড়িয়ে যেতাম। এই টেবিলে অমুক ওই টেবিলে তমুক। হঠাৎ উদয় ভান সিংয়ের সাথে চোখাচোখি হল একটা টেবিলের পাশ দিয়ে যেতে যেতে। আগে পাটনায় স্কেল থ্রী ছিল। এখন প্রেমিসেসএর ডি. জি. এম। আমি জি. এম. এর সাথে আছি দেখে ডাকতে দোনামোনা করছিল। আমিই এগিয়ে গিয়ে নমস্কার করলাম, হাত মেলালাম। বিকাশদা ততক্ষণে একটা টেবিলে গিয়ে বসেছেন।

— কি খাবে বল। ভাত খেয়েছ?

— (ঘুরিয়ে মিথ্যেটা বললাম) না, ভাত খাইনি তবে ঢুকবার আগেই পেটভরে জলখাবার খেয়ে ঢুকেছি ... কাজেই কিছু খাবোনা।

— চুপ করো তো! (সামনে দাঁড়ানো কর্মচারীটিকে) আজকের স্পেশাল তো ফিশ কবিরাজী! ঠিক আছে — একটা ফিশ কবিরাজী আর চারটে রাজভোগ আগে নিয়ে এস। তারপর এক পট চা দিয়ে যেও। (সে চলে যেতে) এবার বল তোমার খবর কি?

— চলছে।

— বাড়িতে সবাই ভালো আছেন?

— হুম্।

— আচ্ছা তুমি বিয়ে করেছ কিনা সেটা আগে বল। আজকাল তো বড় নেতা হয়ে গেছ। হেড অফিসে আস চলে যাও খবর পাই। বম্বেতে যখন ছিলাম একবার ফোন করলে আসবে, কিন্তু এলেনা। কী, বিয়ে করেছ?

— কেন সে খবরটা পাননি?

— কার্ড দিয়েছিলে আমাকে?

— আসলে আপনারা এত ওপরের লোক ...

— শালা! আমি ওপরের লোক তাই না? জীবনে ভালো নেতাও হতে পারবেনা এই মানসিকতা রাখলে!

— (লজ্জা পেয়ে মাথা নিচু করে বললাম) তখন আপনি হায়দ্রাবাদে ছিলেন।

— যাক এতদিন নেতাগিরি করেও মিথ্যে বলতে শেখোনি। নইলে বলতে পারতে 'পাঠিয়েছিলুম তো, পাননি?' ছেলে মেয়ে কটি?

— এক ছেলে।

— কত বড়?

— পাঁচ বছর।

খাবার এসে গিয়েছিল। পেটে মিষ্টিটা যেতে ধড়ে প্রাণ এল। বিকাশদা চা তৈরি করছিলেন।

— তুমি এসেছ কেন বলতো? কোনো বিশেষ কাজ আছে মনে হচ্ছে।

— (বিকাশদার দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে বলতে গিয়ে হেসে ফেললাম) খুবই স্পেশ্যাল কাজ। তাই আমাকে পাঠানো হয়েছে।

রাজভোগের শেষটুকু জল দিয়ে গিলতে গিলতে 'পাঠানো' শব্দটা বলতে পেরে একটু হাল্কা হলাম। 'ওনাস অফ গিল্ট' গেল রাজীব আর বড়বাবুর ঘাড়ে। এবার হাল্কা ভাবে কথা বলা যাবে। কিন্তু কিভাবে বলা

যায় ? নাঃ পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক বলে ফেলাই ভালো ।

-- আপনি তো বোর্ডে আছেন---স্কেল টু থেকে থ্রী এর ইন্টারভিউএ!

-- কাউকে পাশ করাতে হবে ? (বিকাশদা মিটিমিটি হাসতে লাগলেন) তা কই দাও তোমাদের লিষ্ট ! লাল লিষ্ট আর কালো লিষ্ট !

-- আপনিও লিষ্ট নেন ? (ভ্যাবাচ্যাকা ভাবটা ধরা পড়ে গেল)

-- লিষ্ট না নিলে চলবে ? (আমাকে তখনও ভ্যাবাচ্যাকা দেখে বলতে থাকলেন) আসলে দ্যাখো ব্যাপারটা নিয়ে অনেক ভেবেছি । যেদিন প্রথম আমাকে ইন্টারভিউয়ের দায়িত্ব দেওয়া হল তার পাঁচ দিন আগে থেকেই তদ্বির পৌঁছোতে শুরু করে দিয়েছিল । প্রথমে যথারীতি সবাইকে ভাগিয়ে দিতাম। তারপর দেখি তদ্বিরের নামগুলো মাথায় কিলবিল করে, ঘুমোতে দেয়না । কে কোথায় পড়ে আছে, কে কোন অন্যায়ের শিকার, আমিই নাকি আশা ভরসা সৎ ব্যক্তি বলে ।... প্রথম প্রশ্ন জাগল পাঁচ দশ মিনিটের ইন্টারভিউয়ে আমি কি বিচার করতে পারব, কে যোগ্য আর কে যোগ্য নয় ? দ্বিতীয় প্রশ্ন জাগল আমার বিচার ঠিক হলেও কি রেজাল্ট ইন্ড করবে -- যখন নাকি আরো দুজন মেম্বার আছে বোর্ডে? তৃতীয় প্রশ্ন প্রত্যেকের পারফর্মেন্স সম্পর্কে যে রিপোর্ট এবং তাদের কন্ট্রোলিং অফিসারদের দেওয়া মার্কিং ... তা যে বায়াস্‌ড নয় কে বলবে ? আর চতুর্থ প্রশ্ন জাগল এই যে তদ্বির আর তোমাদের অর্থাৎ বিভিন্ন ইউনিয়নের দেওয়া লাল লিষ্ট আর কালো লিষ্ট---এও তো এক ধরণের ফিল্ড রিপোর্ট ! নানান মিথ্যের মধ্যে সত্যের এক এক কণা লুকিয়ে আছে ! ... সেদিন থেকে আর তদ্বির নিয়ে এসেছে শুনলে ভাগিয়ে দিইনা । বসাই

আরো গভীরে গিয়ে জানতে চাই তদ্বিরের কারণ । নিজের ব্যক্তিগত নোট প্যাডে যথাসম্ভব নোট রাখি । কমিশন আর মদের বোতল না নিলেই তো হল ? এবার বল । লিষ্ট নিয়ে এসেছ ?

-- (বিকাশদার কথাগুলো মাথায় ঘুরছিল) না, লিষ্ট আপনাকে দেব যথা সময়---বা নাও দিতে পারি ! আমরা আজ অব্দি অফিসারের ইন্টারভিউতে এসব করিনি ।

-- ওটা ফালতু আইডিয়ালিজম । লিষ্ট দিয়ে তোমরা জাজমেন্টে সাহায্যই করবে । যাক, তাহলে কি ব্যাপার ?

-- একজনের সম্বন্ধে স্পেশ্যাল উল্টো তদ্বির করতে এসেছি (পুরো ব্যাপারটা বললাম) ।

-- এই তো পথে এসেছ । তাহলে দেখছ তো তদ্বিরের প্রয়োজন? বড়বাবু যখন বিশেষ একটি লোকের প্রমোশন চাইছেন না তখন নিশ্চয়ই কিছু কারণ আছে। যদি কারণটা সংস্থাগত না হয়ে ব্যক্তিগতও হয় তাহলেও মূল্য রাখে। কেননা বড়বাবুর কথার দাম আছে । এতদিন ধরে ট্রেড ইউনিয়ন করছেন। বড়বাবুর বাড়ির ফোন নম্বরটা দাও তো ।

-- উনি কিন্তু চাননা যে ওঁর নামটা ...

-- সে তুমি আমার ওপর ছাড় ।... নম্বরটা দাও । এমনিতেও বহুদিন কথা বলিনি । ব্যাঙ্ক জীবনে তো আমার সিনিয়র ! তাছাড়া গুরুদেব লোক! (মুচকি হেসে কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন) ট্রেড ইউনিয়ন করার একটা বড় দিক ওই জেনারেশনের লোকেদের কাছ থেকে তোমরা নিতে পারোনি ।

--- ?

— খোঁজ নিয়েছ কখনো, বড়বাবু কতক্ষণ কাজ করেন নিজের ব্রাঞ্চে ? ওনার আউটপুট কী আর ব্রাঞ্চে ওনার কন্ট্রিবিউশনই বা কী ? বড়বাবুর ভাষাতেই বলছি, ওঁদের জেনারেশনের লোকেরা ট্রেডটা সিনসিয়ারলি দেখতেন বলেই ইউনিয়নও ততটাই সিনসিয়ারলি দেখতে পেতেন । (ইষৎ প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিলাম, থামিয়ে দিলেন) তোমার বা তোমাদের কথা বলছিনা — এটা সাধারণ অবক্ষয় ! কর্মচারীরাও আজ নেতাকে বেশীক্ষণ কাজ করতে দেখলে ভাবে শক্তিহীন— পাওয়ারলেস !... (গুটিয়ে নিলেন) এনি ওয়ে ! আমি হয়ত নিজের এক্তিয়ারের বাইরে চলে যাচ্ছি ! মাইন্ড কোরো না ।

* * *

মজলিশ বসেছে । বড়বাবুর এই নিভৃত মজলিশে রাজীব আর আমিই শুধু নতুন লোক । বস্তুতঃ এ মজলিশ তো বসে তাঁর নিজের শহরে। এখানে মাঝে মধ্যে এলে তাঁর এ মজলিশের পুরোনো দু চারজন শরিক রাত্রে হোটেলে মজলিশের আয়োজন করে । তবে এ বারের আয়োজনটা রাজীবই করেছে । আয়োজন মানে ম্যাকডোয়েলের একটা বোতল আর পর্বত প্রমাণ সুস্বাদু ভুঁজা। ভুজায় রয়েছে খোলায় ভাজা চিঁড়ে, বাদাম, ছোলা, মটর, মকই আর স্বাদ বাড়াবার জন্য সেউ ভাজা । সঙ্গে সাত জনের মত পেঁয়াজ কাঁচালঙ্কা আর নুন । সাত জনের মধ্যে আমি, রাজীব আর বড়বাবু ছাড়া বাকি চারজন হল মেন ব্রাঞ্চের চাপরাশি যোগেন্দ্র রাম, শেখপুরা ব্রাঞ্চের ম্যানেজার নরেন্দ্র সিং, মণিভুষণ আর আমাদের গার্ড সাহেব সুকুলজী। এছাড়া ও আছে অষ্টম জন । মদ ছোঁবেনা বলে মজলিশ থেকে ইষৎ আলাদা একটা চেয়ারে বসে ভুঁজা আর কোল্ড ড্রিঙ্ক চালাচ্ছে — সে

হল অমর । বরুণদা এ মজলিশে থাকলে অমরের সঙ্গী হতেন । তবে পারতপক্ষে তিনি থাকেন না ।

— না না বাড়ি না, বুঝলে রাজীব ! কারোর বাড়ীতে আমি পারত পক্ষে উঠিনা । (একটা বড় ঢোঁকে আধ গেলাস সাফ করে) আমি কি জানিনা তোমরা শহরে ছোট ছোট বাড়িতে কত কষ্ট করে দিন গুজরান করো ? বাড়িতে উঠলে পুরো বাড়ি ডিস্টার্ব হয়ে যায় । তাই হোটেলই ঠিক । তারপর শোনো নরেন্দ্র সিং! ওই শালা জিয়ালাল, যাকে নিজের ছোটো ভাইয়ের মত সেই এ্যাপয়েন্টমেন্টের দিন থেকে আগলে আগলে রাখলাম সে কিনা বাড়িতে এসে ... তাও খাবার টেবিলে ... রাতের খাবারটা তখন আমাদের বাড়ীতেই এসে খেয়ে যেত ... আমিই বলেছিলাম ... নতুন এসেছে, একা একা থাকে, হাত পুড়িয়ে রাঁধতে হবে ভেবে ...হাসতে হাসতে বলে কিনা "ভাবীজী, বড়বাবুকে বোঝান, কেন মিছিমিছি ডি. এন. সিং এর সাথে লড়াই বাধিয়ে নিয়েছেন ! হাজার হোক ও ব্রাঞ্চের ম্যানেজার, আমাদের সবাইকার মালিক, তার ওপর জাতভাইও বটে । একটু মানিয়ে নিয়ে চললেই যখন কাজ হয় । বড়বাবুর মানসম্মানটা তো আমাদেরই দেখতে হবে ..." । ব্যাস্, ওই 'মান-সম্মান' শুনেই আমার বৌয়ের পারা গরম । মাংস দিতে যাচ্ছিল আরেক হাতা । আমি দেখছিলাম। দিল । আবার জিজ্ঞেস করল 'আরেকটু দেব ?' তারপর হাতাটা নামিয়ে বলল "মান সম্মান ? মানিয়ে নেওয়া ? জাতভাই ? তা এই কথাগুলো তোমাদের ওই ম্যানেজারকে না বলে আমাকে বলছো কেন ? এতই যখন অসুবিধে হচ্ছে তোমার, বড়বাবুর কাছের লোক হিসেবে সবাই জানে বলে তো সম্পর্কটা বরং শেষ করে ফেল । কাল থেকে আর এ বাড়িতে এসোনা।"

জিয়ালাল সে পা-ফা ধরে ক্ষমা চেয়ে ... কিন্তু গিন্নী অনড়।

— তারপর আর কখনো আসেনি বাড়িতে ?

— নাঃ। এটাই তো ওর কাওয়ার্ডিস। শ্রদ্ধার জোর থাকলে নিশ্চয়ই আসত। এমনি কাটাতে পারছিলনা, একটা বদমাইসি কথা বলে গালি খেয়ে কাটালো। জাত ফাত আমি মানিনা আমার বৌও মানেনা। কিন্তু একেই বলে সংস্কার না থাকা। ... একি, বোতল তো শেষ হয়ে গেল।

— ওই তো আছে !

— ওইটুকুতে সবাইকার... ?

এক বাক্যে রাজীব, আমি আর সুকুলজী বলে উঠলাম যে আমাদের আর চলবেনা। অমর আরেকটু জুড়ল যে রাজীবের বাড়ি অনেক দূরে; রাত হয়ে গেছে।

— রাত দশটায় অনেক রাত ? ইউনিয়নবাজী করবে তো দিল সে করো ! আর তুমি কি ফুট কাটছো হে ছোঁড়া ? চুপচাপ নিজের কোকোকোলা নিয়ে বসে থাকো। নয়তো মিশে যাও পাপীদের দলে ।... এ্যাই মণি বেল টেপো তো !

— সত্যি বলছি বড়বাবু...

— আমি কি বলেছি তুমি মিথ্যে বলছ ? দেখ আমিও কিন্তু ড্রাঙ্কার্ড নই। ইউ জাস্ট লিস্‌ন (বড়বাবুর নেশা এলে ইংরেজী বেড়ে যায়) আই হ্যাড মাই ফার্স্ট হার্ট ট্রাবল টুয়েলভ্ ইয়ার্স এগো। এ্যান্ড মাই ডক্টর ডিড এ্যাডভাইস মি টু টেক টু এন্ড এ হাফ পেগ অফ লিকার এভরি ইভনিং এন্ড দেন গো টু স্লীপ। আই এ্যাম ডুইং দ্যাট এন্ড আই এ্যম ফাইন ! নো হেভী ফুড। জাস্ট ঠেঠ বিহারী ভুঁজা এন্ড টু এন্ড এ হাফ পেগ। (বেয়ারা

এসে দাঁড়ালো) হ্যাঁ এই যে, একটা হাফ নিয়ে এসো তো! (পকেটে হাত দিতে যান)

— বড়বাবু দাঁড়ান, (রাজীব বলে ওঠে) আপনি আবার পকেটে হাত দিচ্ছেন কেন। (বেয়ারাকে) একটা ম্যাকডোয়েল, না, ম্যাকডোয়েল না একটা ওল্ড গোল্ড নিয়ে এস তো গ্রীন লেভেলের !

— হাফ তো ! (মণি মনে করিয়ে দিল)

— থাক না ফুল। আদ্ধেক খাওয়া হবে, আদ্ধেক বড়বাবুর কালকের জন্য থাকবে।

— কাল না, কাল না। আমি কাল দুপুরেই বেরিয়ে যাচ্ছি। সো টুমরো ইভনিং আই শ্যাল হ্যাভ মাই মেডিসিন এ্যাট মাই হোম।

— দেখা যাবে। সকালে অনেকেই আসবে আপনার কাছে। তাদের দিয়ে দেবেন। আপনার প্রসাদ পেলে ধন্য হবে সবাই।

একটু পরে স্বচ্ছ ওল্ড গোল্ড চকচক করে উঠল সবার গেলাসে।